দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্রণী সেনানী
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু
— পৃঃ ২৩

নরেন্দ্র মোদীই বর্তমান
ভারতের আইকন
— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ২৬ মে, ২০২৫।। ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৬ মে - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

কীসের মোড়কে মুসলমান তুষ্টীকরণের স্লোগান খুঁজছে তৃণমূল? ‘খেল খতম’ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির প্রেমের মাশুল গুনছে মুসলমানরা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

মেকলীয় পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা ◻ ড. বিবেক ভটনাগর ◻ ৮

ব্যাংক জাতীয়করণ স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড়ো আর্থিক কেলেঙ্কারি ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

নরেন্দ্র মোদীই বর্তমান ভারতের আইকন ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

সিঁদুর অভিযানের প্রেক্ষাপট ◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ১৪

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর ঝলকানিতে দগ্ধ পাকিস্তান ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৫

সরস্বতীকূপই ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রমাণ ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৭

স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রণী সেনানী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ২৩

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর মন্ত্রশিষ্য বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস ◻ তরুণ বিশ্বাস ◻ ২৬

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বহুমুখী প্রতিভা ◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৮

অরণ্যষষ্ঠীই পরিবর্তিত হয়েছে জামাইষষ্ঠীতে ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

অবহেলায় পড়ে রয়েছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি ◻ দিতি ভট্টাচার্য ◻ ৩৩

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশ্বদূত : পরমহংস যোগানন্দ ◻ সুব্রত বাঁশ ◻ ৩৪

ভারতে জেহাদি হামলা আমাদের অনুভূতি ও দায়-দায়িত্ব ◻ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৫

ছেচল্লিশের পদধ্বনি : পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি নিজভূমে পরবাসী ◻ পল্লব মণ্ডল ◻ ৩৮

ওয়াকফ নিয়ে এত অশান্তির নেপথ্যে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজনীতি ◻ কাজি মাসুম আখতার ◻ ৪৩

পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়ার সাতকাহন ◻ নিলয় সামন্ত ◻ ৪৬

মাওবাদের বিরুদ্ধে নাগরিক সচেতনতা ও প্রচার প্রয়োজন ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৮

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯** ◻

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২ জুন
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২ জুন
২০২৫

পরিবেশ রক্ষা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে মা বলা হয়। প্রকৃতি অর্থাৎ পরিবেশই সৃষ্টিকে ধারণ করে রেখেছে। মানুষের বিচার বিবেচনাহীন কাজকর্মের ফলে প্রকৃতি আজ মারাত্মক দূষণের কবলে। এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দুনিয়ার তাবড় তাবড় পরিবেশবিদ। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ রক্ষায় নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় পরিবেশ রক্ষা নিয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজিকার নবীন প্রজন্ম ঠিক করিয়া জানে না ভারতের স্বাধীনতা কোন পাথে আসিয়াছে? এই কথা সত্য যে তাহাদের জানানো হয় নাই। অহিংস অথবা সহিংস পথে তাহা লইয়া অনেক বিতর্ক থাকিলেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে অহিংস আন্দোলনের ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন নাই। তাহারা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন দেশ জুড়িয়া বৈপ্লবিক আন্দোলন বিশেষ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের ভয়ে ভীত হইয়া। অর্থাৎ সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিয়াছে, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক এই বৈপ্লবিক কার্যকলাপ স্তব্ধ করিবার জন্য কতই না দমনপীড়ন, অত্যাচার, অবিচার করিয়াছে। তবু বিপ্লবীদিগের স্বাধীনতার স্পৃহা নষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কত যে স্বদেশভক্ত কবি ও গীতিকার কবিতা ও সংগীত রচনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহারা সবাই মহান। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধে অগ্রগণ্য বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুকেই বলিতে হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বক্ষে কম্পন সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রিটিশ-ভারতের গভর্নর তথা ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের নেতৃত্বদানকারী যোদ্ধা তিনিই। তিনি অভূতপূর্ব কুশলী সংগঠক। ভারতের অর্ধাংশ জুড়িয়া তিনি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশকে বোকা বানাইতে ছদ্মবেশ ধারণে তিনি ছিলেন কিংবদন্তী। বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতির নিমিত্ত ১৯১৫ সালে তিনি ব্রিটিশ শাসনের নজর এড়াইয়া জাপান চলিয়া যান এবং ব্রিটিশ ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের লইয়া তিনি সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। পরবর্তীকালে তিনি সেই বাহিনীর অধিনায়ক তথা স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতৃত্বভার তুলিয়া দেন সুভাষচন্দ্র বসুর হস্তে। তিনিই দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুকে নেতাজী অভিধায় ভূষিত করিয়াছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের সেনাপতি পদে বরণ করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র বসুকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারই তৎপরতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সক্রিয় সমর্থন জানাইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রবাসী ভারতীয়দের সমর্থনের নিমিত্ত তিনি 'ভারত মৈত্রী সমিতি' গঠন করিয়াছিলেন। সবচাইতে বড়ো কথা হইল, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমে অভিভূত হইয়া জাপান সরকার ১৯৪৩ সালে তাঁহাকে জাপানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক উপাধি 'সেকেন্ড অর্ডার অব দ্য মেরিট অব দ্য রাইজিং সান'-এ ভূষিত করিয়াছে।

ঐতিহাসিক সত্য হইল, কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্তঃকরণে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগ্রত করিয়াছিলেন তিনিই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি একজন আজন্ম যোদ্ধা। শুধু তাঁহার একটি যুদ্ধ বাকি রহিয়াছে। আর সেই যুদ্ধই হইবে তাঁহার জীবনের অন্তিম যুদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষী, নিশ্চিতভাবেই তাঁহারই বিপ্লবী-শিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্তিম লড়াই। ইহা অতীব দুঃখের যে, এহেন আজন্ম যোদ্ধার প্রেরণাদায়ী জীবন তথা কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বর্তমান প্রজন্মকে অবহিত করানো হয় নাই। ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে শুধুমাত্র একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করিয়াই দায় সারিয়াছে। তাঁহার প্রেরণাদায়ী জীবন লইয়া পাঠ্যপুস্তকে কোনোরূপ অধ্যায় অথবা তেমন কোনো চলচ্চিত্রও নির্মিত হয় নাই। ১৯৫৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাপান সফরে আসিয়া এই মহান বিপ্লবীর পরিবারের সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই। কিন্তু ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান প্রবাসে আসিয়া তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসুর ধর্মপত্নী তোশিকো সোমার সম্পর্কেও ভারতবাসী বিশেষ অবগত নহে। একজন ভিনদেশীয় দেশপ্রেমিকের আজন্ম লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য এক বিদেশিনী নারীর জীবন উৎসর্গের মহান ইতিহাস কতজনই-বা জানে! ইদানীং নবীন প্রজন্মের অন্তঃকরণে দেশপ্রেমের যে জোয়ার লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহা প্লাবনে পরিণত হইতে পারে ভারতের মহান দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদিগের প্রেরণাদায়ী জীবনগাথার বহুল প্রচারে। ইহা অবশ্যই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় হইতে পারে। স্বস্তিকা পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

সুভাষিতম্

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাহপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।। (মালবিকাগ্নিমিত্রম্, মহাকবি কালিদাস)

পুরানো হলেই কোনো কাব্য যেমন উৎকৃষ্ট হয়ে যায় না, তেমনই নতুন হলেই নিকৃষ্ট হবে এমন কথা নেই। জ্ঞানী মানুষেরা দুটোকেই পরীক্ষা করে উৎকৃষ্টটিকে গ্রহণ করেন আর মূর্খেরা অন্যের কথামতো কাজ করে।

কীসের মোড়কে মুসলমান তুষ্টীকরণের স্লোগান খুঁজছে তৃণমূল?

‘খেল খতম’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২০২১-এ তৃণমূলের ‘খেলা হবে’ স্লোগান নিয়ে তৃণমূল দলেই বিস্তর জল ঘোলা শুরু হয়েছে। তাদের উপদেষ্টার দাবি, চটুল স্লোগানে রাজ্যের মানুষকে আর ভোলানো যাবে না। সাংগঠনিক স্তরের ভোলের খাঁচা পালটে দেওয়ার পাশাপাশি সেকুলারিজমের মোড়কে মুসলমান তুষ্টীকরণের স্লোগান প্রয়োজন। তাতে সাপ মরবে আর লাঠিও ভাঙবে না। ইসামি জঙ্গি দমনে ভারতীয় সৈন্যদের স্যালুট জানাতে পথে নেমেছে তৃণমূল। সর্বসম্মত প্রস্তাবও আসছে। অথচ ২০১৯-এ পুলওয়ামায় ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের হামলার পর বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রত্যাঘাতকে এখনও বানানো গল্প বলেই মনে করে তৃণমূল। পহেলগাঁওয়ে হিন্দু হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনার প্রত্যাঘাতের পর সারা দেশ ও বিশ্ব যেভাবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কোনোভাবে তার বিরোধিতা করতে পারত না। বিদেশি বামপন্থীদের আম ও ছালা কোনোটাই নেই। তারা এতটাই অপাঙ্‌ক্তেয় যে তাদের বিরোধিতা বা সমর্থনে দেশের মানুষের কিছু যায় আসে না। স্ববিরোধিতাই তাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। আর ক্ষমতার বাইরে থেকে দায়িত্বজ্ঞানহীন, ফাঁকা বুলির তর্জন-গর্জন তাদের অভ্যাস। বলা চলে শতবর্ষে তাদের রাজনৈতিক ‘খেল খতম’।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থে ২০২৬ পর্যন্ত বামপন্থীদের জিইয়ে রাখতে চান বিজেপি-র বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। যাতে তারা হিন্দুত্বের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে ‘দাঙ্গা’র আজগুবি তত্ত্ব বোঝাতে পারে। হিন্দুবিরোধী, ভ্রান্ত, সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায় সিপিএমের কিছু মুসলমান নেতা এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের বক্তব্য প্রায় এক। তৃণমূলের কিছু নেতাও ওই ধরনের কথাই বলেন। উভয়ের সুরে কেবল উদ্দেশ্যের তফাত। দুটি ক্ষেত্রের ভাবনা কিন্তু সমান ধরনের। মুনিরের মতো নিকৃষ্টরা হিন্দু বিরোধিতা করে ভারতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকে ভারত জুড়ে অশান্তি ছড়াতে চায়। আর সিপিএম ও তৃণমূলের নেতারা মুসলমান তুষ্টীকরণ করে মুসলমান ভোট বাগিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চায়।

স্বাধীনতার পর ৫৩ বছর ধরে কংগ্রেস দেশ শাসন করেছে। তাই জাতীয় দল হিসেবে তারা যে বিদেশি বাম ও তৃণমূলের মতো কিছু উপদলের কায়দায় দায়িত্বজ্ঞানহীন হবে না সেটা হয়তো স্বাভাবিক। তাদের সমস্যা ব্যক্তির সঙ্গে তাদের রাজনীতিক সমীকরণ এবং দেশকে এক করে দেখা। তৃণমূল রাজনৈতিক উপদল বা ভঙ্গুর দল। অনেকটা পাকিস্তান আর বাংলাদেশ যেমন ভঙ্গুর দেশ। ওই দুই দেশ যেমন বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল, তৃণমূলও ঠিক একইরকমভাবে সিপিএম চালিত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ভেঙে একটি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে তৈরি হওয়া দল। বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো কোনো পূর্ণ রাজনৈতিক দল নয় তৃণমূল। বিদেশি বামেদেরও সেই ব্র্যাকেটেই ফেলা যায়।

গত বছর আগস্ট মাসে অভয়াকাণ্ডের পর থেকেই তৃণমূল যে অনেকটাই ব্যাকফুটে রয়েছে, তা তাদের সমর্থকরা মেনে না নিলেও হাবভাবে তা প্রকাশ পাচ্ছে। ১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে যারা তৃণমূল তৈরি করেছিল, তাদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিলে অনেকেই এখন আর নেই। সামনের সারিতে পড়ে রয়েছে সুব্রত বক্সি, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আর বিনোদনের জন্য মদন মিত্র। সেই সময় মমতার বিরুদ্ধে সব ধরনের পারিবারিক বিষোদ্গার করেছিলেন কংগ্রেসের এক অধ্যাপক নেতা। পরে মমতার কাছে ক্ষমা চেয়ে তৃণমূলে তার ঠাঁই হয়। মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ ওই অধ্যাপক এখন তাঁর লেক গার্ডেন্সের বাসভবনের সঙ্গে পাকিস্তানের জঙ্গি ডেরা ফারাক করতে পারেন না। এসএসসি এবং ডিএ কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তৃণমূল দিশেহারা হয়ে পড়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই তাদের ভাঁওতাবাজি ধরা পড়ে গিয়েছে। ন্যায্য পাওনা এবং চাকরি চুরির এই দুই মামলায় ফেঁসে গিয়েছে তৃণমূল।

এছাড়াও তারা ফেঁসেছে মুর্শিদাবাদে স্থানীয় মুসলমান দুষ্কৃতীদের তোষণ করে। পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতা সারা দেশের হিন্দু ঐক্যকে যেরকম ছুঁয়েছে, তেমনই স্পর্শ করেছে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়কে। ফলে এখানকার মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে ‘হিন্দু’ বা ‘বিজেপি’ জুজু দেখানোর খেলা বোধহয় শেষ হতে চলেছে। মুসলমান ভোট যদি মমতার থেকে সরে যায় যেমন ঘটেছিল বিদেশি সিপিএমের ক্ষেত্রে, তাহলে বলতেই হবে মমতার ‘খেল খতম’।

পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতা সারা দেশের হিন্দু ঐক্যকে যেরকম ছুঁয়েছে, তেমনই স্পর্শ করেছে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়কে। ফলে এখানকার মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে ‘হিন্দু’ বা ‘বিজেপি’ জুজু দেখানোর খেলা বোধহয় শেষ হতে চলেছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদির প্রেমের মাশুল গুনছে মুসলমানরা

মুসলমানপ্রেমীষু দিদি,

আপনি দুর্নীতি করে প্রেম দেখাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টার মাশুল গুনতে হচ্ছে মুসলমান পড়ুয়াদের। আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তবু আপনাকে সবটা জানানো আমার কর্তব্য।

দিদি, এমনিতেই নিয়োগের ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক উদাসীনতার ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার জরাজীর্ণ দশা। এর উপরে নানা মামলা-মোকদ্দমার ফলে স্কুলে স্কুলে স্বাভাবিক পঠনপাঠনের বালাই নেই। মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েও ধাক্কা খেয়েছে। কারণ, আপনার মুসলমান প্রেম দেখতে গিয়ে দুর্নীতি করা।

শিক্ষাদপ্তর থেকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ১০ মে অবধি একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীরা তা পূরণ করে জমা দেবে। এর পরে মেধা তালিকা প্রকাশ এবং সেই অনুযায়ী ভর্তি। এমনটাই নিয়ম। কিন্তু তেমনটি করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে, ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন থাকার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কোনো মেধা তালিকা প্রকাশ করা যাবে না। সুতরাং রাজ্যের ৩৯টি সরকারি স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত। একই রকম অনিশ্চিত উচ্চশিক্ষায় ভর্তিও। গত বছর রাজ্যের অধিকাংশ কলেজ এবং রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বেশ কয়েকটিতে অভিন্ন কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে স্নাতক স্তরে ভর্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এই বছর সেই পোর্টাল চালু করা সম্ভব হয়নি। কারণ, ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা। এক্ষেত্রে কী করণীয়, জানতে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চিঠিও পাঠিয়েছে রাজ্যের প্রথম সারির দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু উত্তর মেলেনি দিদি। আদালতের বিচারাধীন বিষয়ের জটিলতা কাটিয়ে ভর্তির প্রক্রিয়াটি মসৃণ করতে আপনার সরকারও কি যথেষ্ট উদ্যোগী দিদি?

গত বছর কলকাতা হাইকোর্ট ২০১০ সালের পর থেকে রাজ্য সরকারের দেওয়া যাবতীয় ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে। এগুলি মূলত সংখ্যালঘু মানে মুসলমানদের জন্য। যা নিয়ম না মেনে করা হয়। ১২ লক্ষ শংসাপত্র বাতিল করে আলাদত। এর পরে চলতি বছরের মার্চে নতুন করে ওবিসি সমীক্ষার কাজ শুরু করার কথা সুপ্রিমকোর্টে জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার আবেদন করেছে পরবর্তী তিন মাসের জন্য এই মামলার শুনানি যেন স্থগিত রাখা হয়। তখন একবারও ভাবা হয়নি এর ফলে একাদশ ও স্নাতক স্তরে ভর্তির কী হবে।

রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। উচ্চ আদালতের নির্দেশ ছিল, ২০১০ সালের পর থেকে তৈরি সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে। ওই সব সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কোথাও ব্যবহার করা যাবে না। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে যায় রাজ্য। তবে স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে এখন নতুন সেমিস্টার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। একে দিশাহীন ছুটির ধাক্কায় স্কুলের পঠনপাঠন অনিয়তি। তার উপরে দেরিতে ক্লাস শুরু হলে সেই ফাঁক পূরণ করার মতো যথেষ্ট শিক্ষকও নেই। অন্যান্য বোর্ডের শিক্ষার্থীরা যেখানে পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে, সেখানে এতগুলি সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থী নিয়মের ফাঁসে পড়াশোনা শুরু করতে পারবে না, পিছিয়ে পড়বে কিংবা অন্য স্কুলে যেতে বাধ্য হবে। বেসরকারি স্কুলেই বেশি যাবে।

এতটাই কি এ রাজ্যের দুর্ভাগ্য? আপনি নিজের মর্জিমাফিক চলতে গিয়ে সরকারি স্কুলগুলি ইতিমধ্যেই তার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা নেই বললেই চলে। এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলেই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

উল্লেখ্য, গত বছর ২২ মে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। উচ্চ আদালতের নির্দেশ ছিল, ২০১০ সালের পর থেকে তৈরি সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে। ওই সব সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কোথাও ব্যবহার করা যাবে না। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিমকোর্টে যায় রাজ্য। তবে স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত।

অতিথি কলম

মেকলীয় পরিকল্পনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা

ড. বিবেক ভটনাগর

ভারতজুড়ে তাদের শাসন দৃঢ় করার লক্ষ্যে ভারতীয় শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন এবং সেই শিক্ষণ প্রণালীকে বন্ধ করার ব্যাপারে নানা প্রয়াস চালিয়ে যায় ব্রিটিশ শাসক। ব্রিটেনের 'রিলিজিয়াস' শিক্ষার বিপ্রতীপে সেই সময় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এটিই ছিল ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের লক্ষ্যে ব্রিটেনের প্রয়াসী হওয়ার প্রধান কারণ। এর ফলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকার ও চার্চের (গির্জার) নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে এই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এক আমূল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট (সংসদ)। পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি এমন ছিল যাতে ধর্মান্তরণ সহজতর হয়। অর্থাৎ ভারতীয়দের খ্রিস্টানে পরিণত করার বিষয়টি হয়ে ওঠে সহজ। একই সঙ্গে যেন সেই ভারতীয়রা মানসিকভাবে হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সরকারের 'দাস'। এই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ সংসদে পাশ হয় চার্টার অ্যাক্ট। এই আইনের দ্বারা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ভারতীয় শিক্ষা খাতে প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়টি এই আইনে উল্লেখিত হয়। এই নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। ভারত শাসনের ক্ষেত্রে 'ড্রেন অফ ওয়েলথ্' নামক লুঠতন্ত্র অবলম্বন করে ব্রিটিশ প্রশাসন। চরম অর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা ভারত থেকে যাবতীয় সম্পদ, সংগৃহীত বিপুল রাজস্ব, ব্যবসায়িক মুনাফা ব্রিটেনে স্থানান্তরই ছিল 'ড্রেন অফ ওয়েলথ্'-এর মূলনীতি। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনটিও ছিল 'ড্রেন অফ ওয়েলথ্' আধারিত। ভারত থেকে লুঠ হওয়া সম্পদের বিনিময়ে ব্রিটিশ অর্থনীতির উন্নতিসাধনই ছিল এই নীতির লক্ষ্য।

১৮২২ সালে মাদ্রাজের গভর্নর থমাস মুনরোর নির্দেশানুসারে তৎকালীন দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি বিশদ সমীক্ষা করেন ধর্মপাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'দ্য বিউটিফুল ট্রি : ইন্ডিজেনাস ইন্ডিয়ান এডুকেশন ইন দ্য এইটিনথ্ সেঞ্চুরি' বইটির লেখক হলেন ধর্মপাল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ২১টি জেলার কালেক্টর বা জেলাশাসকদের অধীনে এই সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষা রিপোর্টে দেশীয় বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট হতে পাওয়া যায় নানা বিস্ময়কর তথ্য। রিপোর্টটি থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপ শুরুর আগে এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সমগ্র দেশ জুড়ে প্রসারিত। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের সকলের কাছে তা ছিল সহজলভ্য।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়ে ডব্লু অ্যাডাম (১৮৩৫-১৮৩৮) এবং জি.ডব্লু. লেইটনারের পেশ করা রিপোর্টের সারাংশও ধর্মপাল রচিত পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বইটিতে রয়েছে তৎকালীন পঞ্জাব ও বঙ্গপ্রদেশের শিক্ষার অবস্থার বিবরণ। এই সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী সেই সময় শুধুমাত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই প্রায় ১ লক্ষ পাঠশালা ছিল। সমাজের সব জাতি, বর্ণের মানুষ এই পাঠশালাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজের সকল শ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষক পাঠশালা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঠশালায় সকল শ্রেণী থেকে শিক্ষক-ছাত্র উভয়ের যোগদান ও অংশগ্রহণের কারণে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অতি উন্নত। কারুর প্রতি বৈষম্যের লেশমাত্রও ছিল না এই শিক্ষাব্যবস্থায়। শিক্ষাদান ছিল প্রয়োজনীয় কাজের অনুরূপ। ভারতের ইতিহাসে লেখা হয় যে, ইংরেজ শাসনের আগে ভারতে চলছিল অন্ধকার যুগ। সেই সময় সমাজের বড়ো সংখ্যক মানুষ নাকি ছিলেন শিক্ষাব্যবস্থার পরিধির বাইরে। একটি বড়ো শ্রেণী ছিলেন শিক্ষালাভে বঞ্চিত। এরকম একাধিক মিথ্যের মিথকে ভেঙে দেয় এই বইটি।

ধর্মপাল রচিত বইটি থেকে জানা যায় যে, সেই সময় পর্যন্ত ভারতের সব প্রান্তে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তর ছিল অতি উন্নত। চতুর পরিকল্পনার দ্বারা ইংরেজরা তাদের শিক্ষণ প্রণালী ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে ভারতের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার করালগ্রাসে চলে যায় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। ভারতীয় শিক্ষাদান পদ্ধতির শিকড় উপড়ে ফেলে ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। এই নীতির দ্বারা দেশীয় শিক্ষার প্রতি ভারতীয়দের ক্রমশ বিমুখ করে তুলতে সক্ষম হয় ব্রিটিশ প্রশাসন। দেশীয়

> "ইংরেজরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে, নানা প্রক্রিয়ায় ভারতে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ধ্বংসের পাশাপাশি জাতিগত ভিত্তিতে সমাজের একটি বড়ো অংশকে ইংরেজি শিক্ষা হতেও বঞ্চিত রাখে। এই কারণে সমাজের উচ্চবর্ণের বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হলেও সংস্কৃতিহীন ও বিকৃত চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। প্রকৃত শিক্ষালাভে তারাও চিরবঞ্চিত থাকে।"

শিক্ষায় শিক্ষিতদের 'অশিক্ষিত' আখ্যা দেওয়া এই সময় শুরু হয়। ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণকারীদের 'শিক্ষিত' বলে আখ্যা দেওয়া হতে থাকে। ভারতীয় সমাজেরই এক শ্রেণীর লোক এই বিষয়টিতে প্রবলভাবে ইন্ধন দিতে থাকেন। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে এরাই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন।

মেকলে মিনিট হলো ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের প্রধান হাতিয়ার : ভারতে ইংরেজি শিক্ষানীতি প্রণয়নের মূল ব্যক্তিটি হলেন টমাস ব্যাবিংটন মেকলে। তার দ্বারা প্রণীত আইনটি হলো 'মেকলে মিনিট' বা 'দ্য ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট, ১৮৩৫'। ভারতীয় শিক্ষা প্রণালী ধ্বংসের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এই আইনটি ছিল তৎকালীন ইংরেজ প্রশাসনের প্রতি একটি রিমাইন্ডার। ব্রিটিশ প্রশাসনকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়টি এই আইনের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দেন মেকলে। ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রণীত এই আইনটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজিকে ভারতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতজুড়ে পশ্চিমি শিক্ষার প্রসার। বলা বাহুল্য যে, মেকলে প্রণীত শিক্ষানীতি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞান পরম্পরা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। দুইয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্রই ছিল না। এই কারণে মেকলীয় শিক্ষানীতিতে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার প্রতি কোনোরকম গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। মেকলের চিন্তাধারা অনুযায়ী ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা হলো 'অবৈজ্ঞানিক'। আইনে পরিণত হওয়া মেকলে প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে দৃঢ় করে। মেকলে প্রণীত এই আইনের পর ১৮৫৪ সালে চার্লস উড তৎকালীন বড়লাট ডালহৌসির কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই রিপোর্টটি 'উডস্ ডেসপ্যাচ' বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই রিপোর্টটি 'ম্যাগনা কার্টা অফ ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' নামেও পরিচিত। ভারতীয় শিক্ষণ প্রণালী বিষয়ে মতামত দিতে গিয়ে ভারত জুড়ে পশ্চিমি চিন্তাধারায় পরিচালিত, ইংরেজি ভাবধারা-সম্পন্ন একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দেন চার্লস উড। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে যার নাম ছিল— 'হান্টার এডুকেশন কমিশন'। ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালী পুনঃসমীক্ষা করে ব্রিটিশ-ভারত সরকারকে কিছু পরামর্শ দেয় হান্টার কমিশন। এর মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে মদত দেওয়ার সুপারিশ করে এই কমিশন।

১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হওয়া চার্টার আইনে ভারতীয় শিক্ষা খাতে প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের নীতি প্রণীত হওয়ার পর খ্রিস্টান মিশনারিরা এই নীতিটির প্রবল বিরোধিতা শুরু করে। এই কারণে শিক্ষায় অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার নানা কাটছাঁট শুরু করে। পাকা বাড়ি রয়েছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর্থিক সাহায্য লাভের অধিকারী ইত্যাদি নানা শর্ত ব্যয়বরাদ্দের ক্ষেত্রে আরোপ করতে থাকে ব্রিটিশ প্রশাসন। এরপর মেকলেকে নিযুক্ত করার পিছনে ছিল একটি বিশেষ কারণ। শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের অর্থ কোথা থেকে, কীভাবে উঠে আসবে সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করতেই মেকলেকে নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও শিক্ষার মাধ্যম কী হবে, ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে, সেইটি ঠিক করার দায়িত্বও মেকলের উপর ন্যস্ত ছিল। 'লর্ড অফ লর্ড মেকলে' বইটির প্রথম খণ্ডের ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে যে ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করে এক নতুন ভারত। ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে মেকলে কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারকে হস্তান্তরিত মিনিটেও এই ব্যাপারটি হুবহু প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে মেকলে 'ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেশন থিয়োরি'র অবতারণা করেন। মেকলে প্রণীত এই তত্ত্বে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশকে শিক্ষিত করে তোলার বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়। ব্যাপারটা ছিল এইরকম যে উপরের শ্রেণীর লোকজন শিক্ষালাভ করতে থাকলে সমাজের নীচের স্তরেও ধীরে ধীরে পৌঁছাতে বা চুঁইয়ে নামতে থাকবে শিক্ষা। এই ক্ষেত্রে মেকলের সম্মুখে একটি সমস্যা প্রকট হয়। অগণিত ভারতীয়ের বিপ্রতীপে ব্রিটিশরা ছিল মুষ্টিমেয়। ওই কয়েকজন ব্রিটিশকে দিয়ে ভারতীয়দের শিক্ষাদান ছিল কার্যত অসম্ভব। ভারতকে কীভাবে এতটা দুর্বল করা যায় যাতে এই দেশ তার 'স্ব', অর্থাৎ যা কিছু তার স্বকীয় বা নিজস্ব, তাকে ভুলে যেতে পারে— এই বিষয়টিই অনুসন্ধানরত ছিলেন মেকলে। ভারতীয়রা আত্মবিস্মৃত হলে তা কি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হবে? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানী মেকলে তার লক্ষ্যে কতটা সফল হয়েছিলেন সেটা ব্রিটিশ প্রশাসনের উদ্দেশে মেকলের লেখা বিবরণ হতেই জানা যায়। মেকলে লিখেছেন, 'শিক্ষিত ভারতীয় শ্রেণীটির ইতিহাসের উপরেই আমাদের যাবতীয় গুরুত্ব দিতে হবে।' এই কারণে খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতিগত ভিত্তিতে বিভিন্নজনকে নানা অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করে ইংরেজ সরকার। ইংরেজ প্রশাসন দ্বারা গৃহীত জমি নীতির কারণে ভারতের বড়ো সংখ্যক কৃষক 'ভূমিহীন' হয়ে পড়ে। ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হওয়ার পর নিজেদের কৃষিজমিতেই খেতমজুরের কাজে তারা লিপ্ত হয়। এইভাবে ইংরেজরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে, নানা প্রক্রিয়ায় ভারতে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ধ্বংসেরপাশাপাশি জাতিগত ভিত্তিতে সমাজের একটি বড়ো অংশকে ইংরেজি শিক্ষা হতেও বঞ্চিত রাখে। এই কারণে সমাজের উচ্চবর্ণের বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হলেও সংস্কৃতিহীন ও বিকৃত চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। প্রকৃত শিক্ষালাভে তারাও চিরবঞ্চিত থাকে।

(লেখক প্রতাপ গৌরব শোধ কেন্দ্র, উদয়পুরের শোধ অধীক্ষক বা গবেষণা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ব্যাংক জাতীয়করণ স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড়ো আর্থিক কেলেঙ্কারি

১৯৬৯ ও ১৯৮০ সালে ভারতে ব্যাংক জাতীয়করণকে একটি মহান ব্যাপার হিসেবে ধরা হয়। সেই ব্যাপারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কিছু সত্য জানানোর জন্য আজ এই প্রতিবেদন। ব্যাংক জাতীয়করণের কাজ ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যে তিনি কংগ্রেস ভেঙে নিজের নামে দল বানান এবং কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী ও সিন্ডিকেট গ্রুপকে রাজনীতি থেকে প্রায় বসিয়ে দেন।

তিনি মূলত বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলি জাতীয়করণ করেন এবং সুদের হার বাড়িয়ে দেন। সাধারণ মানুষ খুব খুশি হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি সেই সময় ব্যাংকের থেকে লোন (ঋণ) পেতেন? বাড়ি, গাড়ি কিনতে বা সন্তানের পড়াশোনার জন্য? উত্তর হলো— না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা মহাজনের থেকে লোন নিতেন বা গয়না বন্ধক দিয়ে দেউলিয়া হতেন। ভারতের সাধারণ মানুষ ব্যাংক থেকে সুদ নিয়ে বাড়ি করা, গাড়ি কেনা, ছেলে-মেয়েদের পড়ানো শুরু করে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে।

তাহলে সেই সময় কে বা কারা লোন নিতেন ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি থেকে যেখানে আমার-আপনার মতো সাধারণ মানুষ টাকা রাখত?

—টাটা, বিড়লা, আম্বানি, বাজাজ, গোয়েঙ্কা ইত্যাদি বড়ো বড়ো লোকজন ঋণ পেতেন। সঙ্গে ব্যাংক কর্মীরাও কিছু কম সুদে ঋণ পেতেন। ফলে ব্যাংকের কর্মচারীদের কাজ তেমন একটা ছিল না। টাকা সরকারের ঘরে যাওয়ার পরে কোথায়, কত সুদে সরকার ধার দিত তা ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজাররাও অনেক সময় জানতেন না।

কিন্তু সুদের হার কত ছিল? ১৮ থেকে ২৪ শতাংশ। এত টাকা সুদে ঋণ নিতেন ব্যবসায়ীরা? কীভাবে ব্যবসা করতেন?

সেই সময় প্রতিযোগিতা ছিল না। খরচ বাড়লে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হতো। ক্রেতাদের প্রতি ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাদের মনোভাব ছিল— কিনলে কেনো, নইলে কিনো না। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে, অর্থাৎ যখন ইন্দিরাজী নিহত হন, তখন দমদমের মতো কলকাতার লাগোয়া (সেই সময় পুরোপুরি আর্থিক রাজধানীর তকমা হারায়নি কলকাতা) এলাকায় মেরেকেটে একশোটা বাড়িতে টিভি ছিল, ৫০টা বাড়িতে ফ্রিজ, আর ডাক্তারবাবুরা বড়োলোক বলে তাঁদের বাড়িতে স্কুটার থাকত। কিছু নেতা বা ঠিকাদার গাড়ি কিনতেন, কিন্তু নিজেরা চড়তেন না। সরকারি অফিসে ভাড়া খাটাতেন। স্যুট-বুট পরিহিত লোকজন ধার করে তাঁদের ঠাঁটবাট বজায় রাখতেন, সাধারণ লোকজন বছরে দুটো জামা, একটা প্যান্ট বানাতেন বা কিনতেন। প্রতিটি পাড়ায় ছিল গড়ে ৫ থেকে ৬টা পাকা বাড়ি। ফ্ল্যাটবাড়ি ছিল খুবই কম। কারণ ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংককে ওই পরিমাণ টাকা সুদ দিয়ে যে ফ্ল্যাটের যে দাম হতো তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় কুলোতো না। আর ব্যবসা সবাই করতে পারত না সেই যুগে। যারা আইএএস আধিকারিকদের উৎকোচ দিয়ে গান্ধী পরিবারের কাছে পৌঁছাতেন, তারাই একমাত্র ব্যবসা করতে পারতেন। কারণ লাইসেন্স প্রথা।

কিন্তু এই ঋণ এত সুদ-সহ এই বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীরা শোধ করতেন ব্যাংককে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোধ করতেন না। পরে ব্যাংক সেই সব লোন মকুব করে দিত এবং সরকার অতিরিক্ত টাকা ছাপিয়ে ব্যাংককে সাহায্য করত। এর পোশাকি নাম— 'ক্যাপিটালাইজেশন'। এর ফলে হতো মুদ্রাস্ফীতি। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ত। সরকারি ক্লাস ওয়ান অফিসাররাও মাসের শেষ ৫ দিন বাজার থেকে মাছ ইত্যাদি আনা বন্ধ করতেন। ১৯৭৪ সালে দেশের মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৩০ শতাংশ এবং জিডিপি বৃদ্ধির হার ১ শতাংশ। ১৯৭৮ সালে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার হয় ঋণাত্মক। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত শিল্প এমন জায়গায় যায় যে আইআইটি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়াররা ব্যাংক, মিলিটারিতে যোগ দেয়। সাধারণ মানুষের শ্রেণীভুক্ত যুব সম্প্রদায়ের একটি অংশ হয়ে ওঠে মাওবাদী। জনঅরণ্য, চৌরঙ্গী, আপনজন ইত্যাদি উপন্যাস ইন্দিরা গান্ধীর কুশাসনের ইতিহাস বহন করে।

১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় ব্যাংক জাতীয়করণের প্রথম পর্যায়। ২০০২ সালে অটলজী দেশে ব্যাংকের ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে আইন আনেন। সারফাইসি অ্যাক্ট। আইন থাকতেই কেউ টাকা দেয় না, সেখানে অটলজী-পূর্ববর্তী পর্যায়ে আইন রাখাই হয়নি কেন? কারণ লুঠের সব রাস্তা খুলে রাখেন ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৯১ সালে দেশ দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হলে নরসিংহ রাও ক্ষমতায় এসে দেশকে বাঁচান। কিন্তু আইন তৈরি করতে পারেননি কংগ্রেসি ইকোসিস্টেমে থেকে। ২০১৬-তে আরও কড়া আইন আনেন মোদীজী। আইবিসি-২০১৬। এবার জেলে যায় বড়ো বড়ো প্রোমোটার, চিটফান্ড মালিক, দেশ থেকে পালায় নীরব মোদী, মেহুল চোকসিরা। এই ঘটনা ইন্দিরা গান্ধীর ১৫ বছরের শাসনকালে একবারের জন্য ঘটেনি কেন? কারণ লুঠের মূল কারিগর ছিল সরকারই।

দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা ভূমি সংস্কারের মতো ব্যাংক জাতীয়করণের এতো বড়ো মাপের লুঠতরাজকেও একটা মহান ব্যাপার হিসেবে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে এসেছেন গত সাড়ে পাঁচ দশক। □

নরেন্দ্র মোদীই বর্তমান ভারতের আইকন

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের অপারেশন সিঁদুর আপাতত স্থগিত। তারপর থেকে এদেশের কিছু মোদীবিরোধী শক্তি, রাজনৈতিক নেতা, সামাজিক ব্যক্তিত্ব এই সেনা অপারেশন বন্ধ হওয়াকে সরাসরি ভারতের ভীরুতা, আমেরিকার চোখরাঙানি এবং মোদীর রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব বলে বর্ণনা করতে শুরু করেছে। কেউ কেউ এমনও বলছেন যে 'আপনি ইন্দিরা হতে পারলেন না মোদীজী। এ লজ্জা আপনার'। গণতান্ত্রিক দেশে প্রশ্ন তোলার অধিকার সবারই আছে। কিন্তু তার উত্তর পেতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে ১৯৭১-এর প্রেক্ষাপট আর ২০২৫-এর পরিস্থিতি কি এক? ভারতের এই 'অপারেশন সিঁদুর' কি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে আঘাত করার জন্য করা হয়েছিল, নাকি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে হত্যা করার জন্য? না, এর কোনোটাই নয়। ভারত এই অপারেশন করেছিল পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তান মদতপুষ্ট ইসলামিক জঙ্গিদের দ্বারা বেছে বেছে ২৬ জন নিরাপরাধ হিন্দু হত্যার বদলা নিতে। আমাদের ঘরের হিন্দু মায়েদের সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়ার প্রতিকার করতে।

যে সময় কাশ্মীরে এই ঘটনা ঘটে সে সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউনাইটেড আরব আমিরাত সফরে ছিলেন। ঘটনা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন এর প্রত্যাঘাত তাদের কল্পনার চেয়েও বেশি মারাত্মক হবে। সত্যিই, প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছেন। ৬ ও ৭ মে, এই দুদিনে ভারত এমন বদলা নিয়েছে যা সত্যিই সন্ত্রাসবাদীদের কল্পনার অতীত। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমরা ঘরে ঢুকে মারবো, সন্ত্রাসবাদীদের মাটিতে মিশিয়ে দেব'— আমাদের সেনাদের অদম্য সাহস ও পরাক্রম, আর প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাশক্তি সন্ত্রাসবাদী ও তাদের আশ্রয়দাতা পাকিস্তানের শিরদাঁড়া ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পর দেশবাসীর একটাই দাবি ছিল— বদলা চাই। পাকিস্তানও বুঝতে পেরেছিল ভারত প্রত্যাঘাত করবে। কিন্তু সে আঘাত কবে ও কীভাবে আসবে তা ছিল তাদের ধারণার বাইরে। ২৩ এপিল ভারত প্রথমে পাকিস্তানকে আঘাত দিল নন মিলিটারি অ্যাকশনের মাধ্যমে। ১৯৬০ সালে জওহরলাল করা ইন্দাস ওয়াটার ট্রিটি অর্থাৎ সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি রদ্ করে ভারত প্রথম পাকিস্তানে আঘাত হানলো। যে সিন্ধুর জলের ওপর পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ কৃষিকাজ নির্ভর করে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঝিলাম ও চেনাব নদীর জল আটকে দিয়ে ভারত পাকিস্তানকে ভাতে মারার কাজ শুরু করল। মোদীজী বললেন, 'জল আর রক্ত একসঙ্গে বইতে দেব না'। পঞ্চাশ বছরে যা সম্ভব হয়নি, পাকিস্তানের কাছে বারে বারে আঘাত পেয়েও জওহরলাল বা ইন্দিরার মতো শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রীরাও যা করতে পারেননি, মোদীজী তাই করে দেখালেন। একই সঙ্গে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সব রকমের বাণিজ্য বন্ধ করে আটারি-ওয়াঘা বর্ডার সিল করে দিল এবং ভারতে আসা সমস্ত পাকিস্তানিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মোদীজী এই ১৪ দিনে প্রায় কুড়িটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে নিজে কথা বলেছেন। কীভাবে পাকিস্তানকে একঘরে করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় তার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছেন। মোদীজীর কূটনৈতিক দৌত্যে শুধু বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তিশালী দেশগুলিই নয়, সৌদি আরব, ইউএই-সহ প্রায় বেশিরভাগ ইসলামি দেশও এই বিষয়ে ভারতকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। বিশ্বে একঘরে হয়েছে পাকিস্তান। তারপরে ৬ ও ৭ মে রাত থেকে শুরু হলো নির্ণায়ক আঘাত। ৬ তারিখ রাতে ভারত সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিল চাইলে সে কী না করতে পারে। কেবল পাক অধিকৃত কাশ্মীরেই নয়, চাইলে সে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার পার করে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসবাদের ডেরা গুঁড়িয়ে দিয়ে আসতে পারে।

অপারেশন সিঁদুরের প্রথম লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের ভেতরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া, যেখানে পাকিস্তানি সেনার ছত্রছায়ায় বসে উগ্রপন্থীরা ভাবত তারা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ, ওখানে গিয়ে কেউ তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ওই ঘাঁটিগুলিতে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খুঁজে খুঁজে নিকেশ করা। কিন্তু ভারত প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল উগ্রপন্থীদের টার্গেট করতে গিয়ে এই অভিযানে যেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বা সাধারণ নাগরিকদের কোনো ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ এই লড়াই ছিল বিশুদ্ধভাবে ইসলামি উগ্রপন্থা ও উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে, কোনো দেশের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ নয়।

এখন প্রশ্ন, ভারত কি সেই লক্ষ্য ঠিকভাবে পূরণ করতে পেরেছে? এর উত্তর হ্যাঁ, পেরেছে। ভারতের এই

যিনি পাকিস্তানকে চোখ রাঙিয়ে বলতে পারেন 'সমঝে যাও, অপারেশান সিঁদুর স্থগিত হয়েছে মাত্র, বন্ধ করা হয়নি। সেনাকে 'খুলি ছুট' দেওয়া আছে। ওপার থেকে গুলি এলে, এপার থেকে গোলা চলবে। আবার ঘরে ঢুকে মারবো'। আমাদের এই মোদীই ভালো। এই মোদীই ভারতের আইকন।

ফ: ২

আক্রমণে পাকিস্তানের নয়টি জেহাদি ট্রেনিং ক্যাম্পের ঠিকানা, যার পাঁচটি ছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীরে, আর চারটি ছিল পাকিস্তানের ভেতরে সেগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে। ভারত এই প্রথমবার পঞ্জাব প্রভিন্সে ঢুকে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন— এদের ডেরা ধ্বংস করে উপপন্থীদের নিকেশ করে এসেছে। একসময় মহম্মদ ঘোরি, তৈমুর লং, সুলতান মামুদ ভারতে ঢুকে ভারতের মঠ-মন্দির ভেঙে তছনছ করে দিত। আজ আমাদের সেনা বিদেশের মাটিতে গিয়ে এই প্রথম এতগুলি জঙ্গিঘাঁটিতে ধ্বংসলীলা চালিয়ে এল। কোনো ভিন দেশে ঢুকে তার ন'-নয়টি জঙ্গি ক্যাম্প ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে এল। যা স্মরণ করলে পাকিস্তানের আগামী প্রজন্ম আগামী ১০০ বছর এই বলে যন্ত্রণায় কাতর হবে যে, ২০২৫ সালে কোনো এক মোদী সরকার এবং তার সেনাবাহিনী 'অপারেশন সিঁদুর' নামে এক সেনা অভিযানের মাধ্যমে তাদের কী হাল করে ছেড়েছিল! তারা মনে করবে দেশের ভারতের মায়েদের সিঁথির সিঁদুর যারা মুছে দিয়েছিল তাদের উপর কী ভয়ংকর শাস্তি নেমে এসেছিল।

এই অপারেশনে পাকিস্তানের যে ন'টি উগ্রপন্থী ট্রেনিং ক্যাম্প ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই আছে 'সাওয়াইনালা ক্যাম্প', মোজাফ্ফরাবাদ, যা এলওসি থেকে ৩০ কিলোমিটার ভেতরে, পিওকের অন্তর্গত। ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে আমাদের মায়েদের সিঁথির সিঁদুর যারা মুছে দিয়েছিল তাদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল এই ট্রেনিং ক্যাম্পেই। তারপর দ্বিতীয়টি হলো 'সৈদানা বিলাল ক্যাম্প', মুজাফ্ফরাবাদ, এটি জইশ-ই-মহম্মদের ট্রেনিং সেন্টার। তৃতীয়টি হলো 'গুলপুর ক্যাম্প', কোটলি, এলওসি থেকে ৩০ কিলোমিটার ভেতরে লস্কর-ই-তৈবার বেশ ক্যাম্প এটি। ২০ এপ্রিল ২০২৩, পুঞ্চে এবং ৯ জুন, ২০২৪ কাশ্মীরে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বাসে হামলা করেছিল এই ক্যাম্প থেকে ট্রেনিং নেওয়া জঙ্গিরা। চতুর্থ, 'বার্নালা ক্যাম্প' বিরপগড় যা এলওসি থেকে ৯ কিলোমিটার ভেতরে। পাঁচ, 'আব্বাস ক্যাম্প কোটলি' যা এলওসি থেকে ১৩ কিলোমিটার ভেতরে যা লস্কর-ই-তৈবার আত্মঘাতী প্রশিক্ষণ শিবির। ছয়, 'সারজাল ক্যাম্প, শিয়ালকোট, যা ভারতীয় সীমা থেকে পাকিস্তানের ছয় কিলোমিটার ভেতরে। সাত, 'মেহমুনাজায়া ক্যাম্প', শিয়ালকোট, যা ভারতের বর্ডার থেকে পাকিস্তানের ১৮ কিলোমিটার ভেতরে,— হিজবুল মুজাহিদিনের ট্রেনিং ক্যাম্প। আট, 'মারকাজ তৈবা', মুরিদ, যা ভারতীয় সীমা থেকে ২৫ কিলোমিটার ভেতরে। ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ের হামলা, যা ২৬/১১ নামে কুখ্যাত হয়ে আছে, যার মূল চক্রী আজমল কাসব এবং ডেভিড হেডলি এই ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে তৈরি হয়েছিল। নয়, 'মারকাজ সুভানাল্লাহ' বাহাবলপুর, ভারতের সীমানা থেকে ১০০ কিলোমিটার ভেতরে যা জইশ-ই- মহম্মদের প্রধান কার্যালয়। এই বাহাবলপুর এমন এক ক্ষেত্র যেখানে লাদেনকে খুঁজতে গিয়ে আমেরিকাও তাদের ড্রোন পাঠাবার সাহস করেনি। পাকিস্তান-সহ বিশ্বের কোনো দেশ স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি যে ভারতীয় সেনার এত সাহস বা মোদীজীর এমন ইচ্ছা শক্তি যা বর্ডার থেকে একশো কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে শত্রুদের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে আসতে পারে।

এই অপারেশনের দুটি লক্ষ্য ছিল, এক সন্ত্রাসবাদীদের ক্যাম্প গুলি ধ্বংস করা, দুই, সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা। ভারতের এই অপারেশন ৯টি জঙ্গিঘাঁটি এবং সেখানে লুকিয়ে থাকা বিশ্বের মোস্ট ওয়ান্টেড একশোরও বেশি উগ্রপন্থীকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসবাদী, ছিল লস্কর-ই-তৈবার মারকাজ-ই-মুদ্রিকের ইনচার্জ মুদস্‌সর? কাদিয়ান খান, ওরফে আবু জিন্দাল। ছিল জইশ-ই-মহম্মদের হাফিজ মহম্মদ জামিল, যে সম্পর্কে মাসুদ আজাহারের শ্যালক এবং 'মারকাজ সুভানাল্লা' ট্রেনিং ক্যাম্পের ক্যাম্পের ইনচার্জ। ছিল জইশ-ই- মহাম্মদের দাবি সন্ত্রাসবাদী, মাসুদ আজাহারের নিকট আত্মীয় মহম্মদ ইউসুফ আজহার, যে ১৯৯৯ সালে কান্দাহারে আইসি-৮১৪ বিমান অপহরণের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড। ছিল লস্কর-ই-তৈবার আবু আসকা খালিদ। এরকম নামকরা একশোর বেশি কুখ্যাত উগ্রপন্থীকে ভারতে সেনারা ঢের করেছে। অপারেশন সিঁদুরের লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংস করা, এতে ভারত সফল হয়েছে। এই প্রথমবার সারা বিশ্ব দেখল পাকিস্তানের প্রতি ইঞ্চি জমি ভারতের টার্গেটের আওতায়। পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মাত্র ২৫ মিনিটের অপারেশন, রাফেল বিমানের মাধ্যমে স্কালফ ও হ্যামার মিশাইলের আক্রমণে পাকিস্তানের ৯টি বৃহত্তর ট্রেনিং ক্যাম্প আজ ধুলায় মিশে গেছে।

এর সঙ্গে সঙ্গে 'অপারেশন সিঁদুর' আজ অনেকগুলো 'মিথ'ও ভেঙে দিয়েছে। প্রথম 'মিথ'— ওপর থেকে এসে সন্ত্রাসবাদীরা যতই হামলা করুক, ভারত পাকিস্তানকে ছুঁতে পারবে না, দূর থেকেই আস্ফালন করবে। কারণ পাকিস্তান পরমাণুধর দেশ, তাকে আঘাত করলেই সে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে। এই মিথ্যা কল্পনা আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ভারতের প্রত্যাঘাতের আগের মুহূর্ত পর্যন্তও যে পাকিস্তান চিৎকার করে পরমাণু হামলার হুমকি দেখাচ্ছিল, ভারত প্রত্যাঘাত করার পর তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ভারত গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে পাকিস্তানের পরমাণু-হুমকি এক ফাঁকা আওয়াজ। এক ধমকে ভারত তা থামিয়ে দিতে পারে। ওই মান্ধাতা আমলের নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলিং আর কাজ করবে না।

দ্বিতীয় 'মিথ'— পাকিস্তানে ভারত আঘাত হানলেই ভারতকে চীনের আক্রমণের মুখে পড়তে হবে, অর্থাৎ শুধু পাকিস্তানের সঙ্গে নয়, চীনের সঙ্গেও ভারতকে যুদ্ধ করতে হবে। এই 'মিথ'ও আজ ভেঙে খান খান। আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বললেই অনেকেই ভারতকে চীনের জুজু দেখাত। 'অপারেশন সিঁদুর' প্রমাণ করল কেবল পাক অধিকৃত কাশ্মীরেই নয়, এবার পাকিস্তানের বুকের উপর ভারত আঘাত হানতে পারে, আর চীনের ভূমিকা সেখানে কেবল নির্বাক দর্শকের মতো। ১২টি সেনাঘাঁটি, ৪টি বিমানঘাঁটি, করাচির নৌঘাঁটি, ৬টি যুদ্ধবিমান, সমস্ত এয়ার ডিফেন্স, নূর খান এয়ারবেস-সহ ৫২ জন বিমানবাহিনীর সদস্য— এত কিছু ধ্বংস হতে দেখেও চীন কেবল বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারবে না।

তৃতীয় 'মিথ' হলো, চীন সামরিক দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নাকি দুর্ভেদ্য। তাই চীনকে সবার সমীহের চোখে দেখা উচিত। 'অপারেশন সিঁদুর' চীনের এই কষ্টকল্পিত ভাবমূর্তিও ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে পাকিস্তান মূলত চীনা প্রযুক্তিই ব্যবহার করছিল। দেখা গেল, চীনা

এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ভারতীয় আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। শয়ে শয়ে চীনা ড্রোন দিয়ে হামলার চেষ্টা কোনো কাজে এল না। সব ড্রোনকেই ভারত মাঝ-আকাশে ধ্বংস করছে। চীনা ফাইটার জেটগুলোও ভারতের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এত দিন ধরে চীনের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে গোটা বিশ্বে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। আর চীনের কাছ থেকে যেসব দেশ যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার কথা ভাবছিল, তাদের মনে এখন চীনের থেকে মিসাইলের চেয়ে ভারতের ব্রহ্মোস মিসাইলের গুরুত্ব বাড়লো।

সেনাবাহিনীর এত পরাক্রমের পরেও নিন্দুকেরা বলছে মোদী নাকি ১৯৭১-এর ইন্দিরা হয়ে উঠতে পারেননি। কারণ তিনি অপারেশন সিঁদুর স্থগিত করেছেন। হে প্রবুদ্ধগণ, আপনারা ঠিকই বলেছেন! ইন্দিরা হওয়া এত সোজাও নয়। তাঁর কার্যকালে (১৯৬৬-১৯৮৪) কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের ওপর যখন জঙ্গি হানা হতো। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ওপর যখন জঙ্গিরা আক্রমণ চালাত, হিন্দুর রক্তে কাশ্মীর উপত্যকা লাল হয়ে উঠত, তখন একটু শোক জ্ঞাপন করে, ২-৪টে জঙ্গি মেরে, কয়েকটাকে জেলে পুরে যদি বীরত্ব প্রকাশ করে কাটিয়ে দিতে পারতেন যেমন তৎকালীন ইন্দিরা সরকার করত তবে হয়তো আজ আপনি এদের চোখে 'আয়রন লেডি'র মতো শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী বলে বিবেচিত হতেন। ১৯৭১ সালে নিজেকে বীর প্রমাণ করতে আয়রন লেডিকে ৯ মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল (২৬ মার্চ-৩ ডিসেম্বর) যতক্ষণ না পর্যন্ত পাকিস্তান এসে পাঠানকোট অমৃতসর আম্বালা বিমানঘাঁটিতে বোমা ফেললো। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের তথ্য বলছে, ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ 'আয়রন লেডির স্বর্ণযুগে পাকমদতপুষ্ট জঙ্গি আক্রমণে নিহত ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা ছিল ১৬৯ জন। তখন যেভাবে আয়রন লেডি চুপ ছিলেন, আপনাকেও একইভাবে চুপ থাকতে হতো, আপনি তো তাঁর মতো 'বীর' নন, তাই পাকিস্তানের ভিতর ১০০ কিলোমিটার ঢুকে একশোরও বেশি জঙ্গি নিকেশ করে এলেন, ১১টি সেনা বিমানঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে এলেন, কান্দহার বিমান অপহরণের মূলচক্রী রউফ আজহারকে ঘরে ঢুকে মেরে এলেন, রহিম ইয়ার খান এয়ারবেস–– যার অনতিদূরেই পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার পাওয়ার সেন্টার তার পাশে মিসাইল হামলা করলেন, মুরিদ এয়ারবেস ধ্বংস করে দিলেন, ১৯৬০ সালে 'তাঁর' বাবার হাতে তৈরি জমিদারির-দানখয়রাত 'সিন্ধু জল বিতরণ চুক্তি' বাতিল করে দিলেন, মার্কিন এফ-১৭ জেট ভূপতিত করলেন, একটাও মিসাইল-ড্রোন হামলাকে কার্যকর হতে দিলেন না! আয়রন লেডির আমলে পাকিস্তান অমৃতসর বিমানঘাঁটিতে ২টি ৫০০ কেজির বোমা ফেলেছিল, পাঠানকোট বিমান ঘাঁটিতে ৮টি ১২৫ কেজির বোমা ফেলে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, ভারত সেদিন সেটা আটকাতে পারেনি। আর আপনি আজ ওদের ড্রোন, মিসাইল, যুদ্ধবিমান সব ধ্বংস করে দিলেন, তাহলে আপনি কী করে আয়রন লেডি হতে পারবেন মোদীজী!

আরও শুনে রাখুন মোদীজী, আয়রন লেডি হতে গেলে আপনার মতো ১৪ দিন পরে নয়, ১৯৭১-এর মতো ৯ মাস অপেক্ষা করে যুদ্ধে যেতে হয়। আয়রন লেডি হতে গেলে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিকে বিনা শর্তে ভুট্টোর কাছে উপঢৌকন দিয়ে আসতে হয়। আর আয়রন লেডি হতে গেলে পাকিস্তানের হাতে যুদ্ধবন্দি ৫৬ জন ভারতীয় সেনাকে মুক্ত না করে তাদের লাহোরের জেলে পচিয়ে মারতে হয়। এর কোনোটাই যে আপনি করেননি মোদীজী! তবে কীভাবে আপনি নিজেকে আয়রন লেডির মতো শক্তিশালী বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবেন!

যাঁরা ১৯৭১ সালের যুদ্ধ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর পিঠ চাপড়াচ্ছেন, তাদের অবশ্যই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়টি ভালো করে জানা উচিত। যুদ্ধে সেদিন ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ভারতের বীর সেনাবাহিনী সিন্ধুর থারপারকার জেলাকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে গুজরাটের একটি নতুন জেলা বলে ঘোষণা করেছিল। মুজাফ্‌ফরাবাদ সংসদে তোলা হয়েছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। জুলফিকার আলি ভুট্টো যুদ্ধে হেরে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করতে এলেন। সঙ্গে কন্যা বেনজির ভুট্টো। ইন্দিরা গান্ধী ভুট্টোর সামনে শর্ত রাখলেন, 'যদি আপনি আপনার ৯৩ হাজার সৈন্য ফেরত চান তবে আমাদের পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত দিন'। ভুট্টো বলেছিলেন, 'আপনি এই ৯৩ হাজার সৈন্য আপনার কাছে রাখুন, আমরা কাশ্মীর দেব না। স্বাক্ষরও করব না'। ইন্দিরা গান্ধী ভাবতেও পারেননি যে ভুট্টো এই উত্তর দেবে। পুপুল জয়কার এবং কুলদীপ নায়ার দুজনেই তাঁদের বইয়ে লিখেছেন, 'ইন্দিরা গান্ধী এর উত্তর শুনে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন'। ভুট্টো সন্ধ্যায় হোটেলে তার মেয়ে বেনজির ভুট্টোকে বলেছিলেন, 'এই যুদ্ধে ভারতের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের বোঝা ভারত ইতিমধ্যেই বহন করেছে। এখন ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যকে জায়গা দেবে কোথায়? আমরা যা বলবো ইন্দিরা তা মানতে বাধ্য'।

পাকিস্তানের শর্তেই সেদিন সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। যুদ্ধে জিতেও আয়রন লেডি সেদিন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বরং বাধ্য হয়ে ৯৩ হাজার সৈন্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আর ভারতের ৫৬ জন যুদ্ধবন্দি সেনাকে পাকিস্তানের কারগারে মরতে রেখে দিয়েছিলেন। ৮ মাস পর গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থারপারকার জেলাকেও ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সেনাপ্রধান স্যাম মানেক'শ অবসর গ্রহণের পর তাঁর লেখা বই 'The India-Pakistan War of 1971 : A History'-তে লিখেছেন, 'আমরা এই 'যুদ্ধ লড়াইয়ের ময়দানে জিতেছি, কিন্তু চুক্তির টেবিলে রাজনীতিবিদরা ভারতকে হারিয়ে দিয়েছে'। এই ছিলেন আমাদের আয়রন লেডি। নিন্দুকেরা এঁর নাম নিয়ে আজ নরেন্দ্র মোদীকে খোঁটা দিচ্ছে!

না, ভারতের আর ওরকম আয়রন লেডির দরকার নেই। বরং এখন আমাদের এখানকার মতো ভীরু নরেন্দ্র মোদীই ভালো, যিনি পাকিস্তানের চোখে চোখ রেখে উরি হামলার পর পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করতে পারেন, পুলওয়ামার বদলায় এয়ারস্ট্রাইক করতে পারেন, আর পহেলগাঁওয়ের বদলা হিসেবে পাকিস্তানে ঢুকে যোগ্য জবাব দিতে পারেন। যিনি পাকিস্তানকে চোখ রাঙিয়ে বলতে পারেন 'সমঝে যাও, অপারেশান সিঁদুর স্থগিত হয়েছে মাত্র, বন্ধ করা হয়নি। সেনাকে 'খুলি ছুট' দেওয়া আছে। ওপার থেকে গুলি এলে, এপার থেকে গোলা চলবে। আবার ঘরে ঢুকে মারবো'। আমাদের এই মোদীই ভালো। এই মোদীই ভারতের আইকন। □

সিঁদুর অভিযানের প্রেক্ষাপট

অজয় ভট্টাচার্য

পাকিস্তানের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরাচারী সামরিক শাসক ছিলেন জিয়া-উল-হক। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ জিয়াবাদ নামে পরিচিত। যার মধ্যে উগ্র ইসলামি আদর্শ এবং জেহাদের মিশ্রণ ছিল। ১৯৭৭ সালে অপারেশন ‘ফেয়ার প্লে’-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে উৎখাত করেছিলেন জেনারেল জিয়া। এভাবে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনিই হন পাকিস্তানের সর্বেসর্বা। তিনি এতটাই স্বৈরাচারী ছিলেন যে ক্ষমতা দখল করেই দেশের সংবিধান শিকেয় তুলে দেশজুড়ে সামরিক শাসন বলবৎ করেছিলেন। পাকিস্তানের বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির একই পথের পথিক কিনা, এখন এই প্রশ্নই পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে চিন্তায় রেখেছে। অনেকের আশঙ্কা, মুনির সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করতে পারেন। যা নিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতির আকাশে আশঙ্কার কালো মেঘ জমেছে। তার উপরে একদিকে বালুচ স্বাধীনতা যুদ্ধ আর অন্যদিকে ‘অপারেশন সিঁদুর’, সবমিলিয়ে টালমাটাল পাকিস্তানের সরকার ও সেনা দু’পক্ষই।

পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে যে, পহেলগাঁওয়ে হত্যাকাণ্ডের ঠিক এক সপ্তাহ আগে জেনারেল আসিম মুনির ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন করে এবং দ্বিজাতিতত্ত্ব তুলে ধরে এক উসকানিমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। দিনটি ছিল গত ১৬ এপ্রিল। প্রবাসী পাকিস্তানিদের ওই অনুষ্ঠানে তিনি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আমাদের মজহব, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, চিন্তাভাবনা, উদ্দেশ্য— সবই হিন্দুদের থেকে আলাদা। আর এই দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। আদর্শ ও সংস্কৃতিতে আমরা ওদের চেয়ে অনেক এগিয়ে।’ ওই অনুষ্ঠানে

তিনি কাশ্মীরকে জুগুলার ভেন বা ঘাড়ের শিরার সঙ্গে তুলনা করে পাকিস্তানিদের কাছে কাশ্মীর কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝিয়েছিলেন।’ এর পর গত ২২ এপ্রিল ঘটে যায় পহেলগাঁওমের বৈসরন উপত্যকায় সেই নৃশংস ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড। সুতরাং জেনারেল আসিম মুনিরের ওই উসকানিমূলক বক্তব্য যে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র রাখে, সেকথা একেবারে অমূলক নয়। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা বলে নেওয়া দরকার যে, জেনারেল আসিম মুনির নিজেকে যেমন ‘জেহাদি জেনারেল’ বলতে গর্ববোধ করেন, তেমনি তাঁর জেহাদি মতাদর্শকে ‘মুনির মতবাদ’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পছন্দ করেন।

পহেলগাঁওয়ে হত্যাকাণ্ডে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী নিরীহ পর্যটকদের। বাধা দিতে যাওয়ায় এক টাট্টু চালক কাশ্মীরি যুবককেও হত্যা করেছে আততায়ীরা। মোট ২৬ জনকে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। তার মধ্যে ২৫ জনই হিন্দু এবং একজন ছিলেন শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। স্পষ্টতই জঙ্গিদের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করে ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করে দেওয়া। এমনকী সিঁদুর অভিযানের প্রত্যুত্তরে পাকিস্তান ভারতে অস্থিরতা ছড়াতে সীমান্ত এলাকায় থাকা গির্জা ও গুরুদ্বারকে পরিকল্পিত ভাবে নিশানা করছে এবং তার দায় ঠেলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর। ধর্মস্থানকে নিশানা করে আসলে তারা সংঘাতে ধর্মের রং লাগাতে চাইছিল। ষড়যন্ত্রীরা হয়তো জানে না যে, হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি হলো বহুত্ববাদ ও সহনশীলতা— যা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ সেই সত্যকে তুলে ধরে। ফলে শুরু থেকেই ভারত ‘নানা ভাষা ও নানা মত’-এর দেশ। তাই ভারতকে দুর্বল করার দিবাস্বপ্ন না দেখাই ভালো। কিন্তু ভুললে চলবে না যে খলের ছলের অভাব হয় না কখনো। তাছাড়া কুঁজো হলেও তারও শখ হয় সোজা হয়ে শুতে। না হলে বাংলাদেশের ইউনুস ঘনিষ্ঠ নেতা কী করে দাবি করেন যে ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে তারা চীনকে সঙ্গে নিয়ে ভারত থেকে ‘চিকেন নেক’ বিচ্ছিন্ন করে দেবে? সংঘাতে ধর্মের রং লাগাবার হীন ষড়যন্ত্রকে দূর করতে ‘অপারেশন সিঁদুর’ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনগুলি যথেষ্ট। যার মাধ্যমে একদিকে নারীশক্তি, জাতীয়তাবাদের আবেগ এবং তারই পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাকে তুলে ধরছে ভারতর সরকার। পাক সেনাপ্রধান আসিফ মুনির দ্বিজাতিতত্ত্ব খুঁচিয়ে তুলে ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভক্ত করার যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেই ভাষ্যকে খর্ব করতে দুই সেনাকর্ত্রীকে সাংবাদিক সম্মেলনে সামনে রেখেছিল নয়াদিল্লি। তাছাড়া সাংবাদিক সম্মেলনে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহের সঙ্গে কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মানুষ, বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির উজ্জ্বল উপস্থিতি সকলের নজর কেড়েছে।

অপারেশন সিঁদুর প্রমাণ করে দিয়েছে যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের একটি আঁতুড়ঘর। জঙ্গি তৈরির কারখানা। সন্ত্রাসবাদী তৈরির জন্যে সেখানে রীতিমতো ট্রেনিং ক্যাম্প গড়ে উঠেছে। সেই অর্থে ভারত, ইজরায়েলের পরিস্থিতি এইরকম। টিকে থাকতে হলে যুদ্ধই একমাত্র পথ। তা সে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হোক আর পরোক্ষ যুদ্ধ। □

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর ঝলকানিতে দগ্ধ পাকিস্তান

মণীন্দ্রনাথ সাহা

প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পহেলগাঁও কাণ্ডের বদলা মাত্র ২৫ মিনিটেই নিয়েছে ভারতীয় সেনা। গত ২২ এপ্রিল ভূস্বর্গে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনার ঠিক ১৫ দিনের মাথায় গর্জে উঠল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মিসাইল। রাফাল, জাগুয়ার, সুখোই— এই তিন ব্রহ্মাস্ত্রের অভিঘাতে মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যেই গভীর রাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাক পঞ্জাবের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি। দুরমুশ হয়ে গিয়েছে লস্কর, জইশ ও হিজবুলের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই হামলাকে ‘প্রিসিশন স্ট্রাইক’ বলে অভিহিত করেছেন।

গত ৬ মে রাত ১-০৫ মিনিটে শুরু হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী ‘অপারেশন সিঁদুর’ অভিযান। শেষ হয় রাত দেড়টায়। এই ২৫ মিনিটের মধ্যে ২৪ বার আঘাত হানে ভারতীয় বায়ুসেনা। আর তাতেই খেল খতম জঙ্গিদের। সূত্র অনুযায়ী এই অভিযানে অন্তত পক্ষে ১০০ জন জঙ্গি খতম হয়েছে।

এই হামলায় যেসব জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হয়েছে, সেগুলি হলো—

১. মারকাজ সুবহান থাল্লা, বাহাওয়ালপুর, জইশ-ই-মহম্মদের সদর দপ্তর।

২. মারকাজ তৈবা, মুরিদকে— এটি ছিল লস্কর-ই-তৈবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

৩. সারজাল তৈবা কালান— এটি জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আড়ালে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করত জঙ্গিরা।

৪. মাহমুনা জোয়া, শিয়ালকোট— হিজবুল মুজাহিদিনের এই ঘাঁটিও জঙ্গিদের লঞ্চপ্যাড ছিল।

৫. মারকাজ আহলে হাদিস, বারনালা, ভিম্বার— লস্কর-ই-তৈবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের এই মারকাজটি।

৬. মারকাজ আব্বাস, কোটলি— জইশ-ই-মহম্মদের এই আস্তানা পাক সেনার ঘাঁটি থেকে মাত্র দু’কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৭. মাসকাজ রাহিল শহিদ, কোটলি— হিজবুল মুজাহিদিনের এই ঘাঁটি পাহাড়ের কোলে দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র মজুত থাকত এখানে।

৮. সাওয়াই নাল্লা ক্যাম্প, মুজফফরাবাদ— মাদ্রাসা-সহ একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো লস্কর-ই-তৈবার এই ঘাঁটিতে।

৯. মারকাজ সাইয়েদনা বিলাল, মুজফ্ফরাবাদ— জইশ-ই- মহম্মদের জঙ্গিরা ভারতে অনুপ্রবেশের আগে এই ঘাঁটিতে এসে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিত।

ভারতের প্রত্যাঘাত আকস্মিক নয়। সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়ার পর অবশেষে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। মাত্র ২৫ মিনিটের ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ পাকিস্তান থরহরিকম্প। যথার্থ নামকরণ করা হয়েছে। পহেলগাঁওয়ে বেছে বেছে হিন্দুদের মেরে হিন্দু রমণীদের সিঁদুর মুছে ফেলার বদলা। বাহাওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদের সদর দপ্তর ধ্বংস করে সেখানে থাকা কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠনের প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারের ১০ জন সদস্য এবং তার চারজন বিশ্বস্ত সহযোগিকে সরাসরি বেহেস্তে বাহাত্তর হুরের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনা। শোনা যাচ্ছে, স্বজন হারানোর বেদনা এবার ভালোভাবে উপলব্ধি করছে মাসুদ আজহার।

কথামৃতের গল্প অনুযায়ী বলতে হয়, ‘দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, তাদের ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে।’ তাই এই অপারেশন সিঁদুরের প্রয়োজন ছিল। ভারতের প্রত্যাঘাত যে যথেষ্ট পরিণত ও সুপরিকল্পিত, তা প্রমাণ হয় এই অপারেশনের নামকরণের মধ্যে দিয়ে। পহেলগাঁও হামলায় যে সমস্ত নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে জঙ্গিরা, সেই নারীদের প্রতি সম্মান জানাতে এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন সিঁদুর।’

মন্ত্রীসভার বৈঠকে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, ‘আমাদের সবার জন্য এটা গর্বের মুহূর্ত।’ প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ‘পাকিস্তানের অনেকটা ভিতরে হামলা চালানো হয়েছে। যেসব জায়গাকে নিশানা করা হয়েছিল, তার মধ্যে চারটি পাক পঞ্জাব প্রদেশে এবং পাঁচটি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে।’ মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোটা অভিযান সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

পাকিস্তানে প্রত্যাঘাতের পরেই গত ৭ মে সকালে বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর ‘অপারেশন সিঁদুর’ লেখা একটি ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেছেন, ‘গোটা বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বা শূন্য সহনশীলতা দেখাতে হবে।’ এর আগে একাধিক ইউরোপীয় এবং এশিয়ার দেশের বিদেশমন্ত্রীদের ফোনেবার্তা দিয়ে বলেছেন, ‘সীমান্তপারের সন্ত্রাস রুখতে ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজ সকালেই গোটা বিশ্ব এর নজির দেখেছে।’ একই সঙ্গে পহেলগাঁওয়ে হামলার পর যেভাবে সারা বিশ্ব ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন এখন সময়ের দাবি।’

ভারতের প্রত্যাঘাতের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন— ‘আমরা জানতাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ভারত ও পাকিস্তান বহু বছর ধরেই সংঘর্ষে জড়িত। আমি চাই, এটা দ্রুত শেষ হোক। ওভাল অফিসে প্রবেশ করার সময়ই আমরা এই খবর পেয়েছি। আমি শুধু আশা করি, বিষয়টি খুব দ্রুতই শেষ হবে।’

‘অপারেশন সিঁদুরে’র সাফল্যে দেশবাসী গর্বিত। পহেলগাঁওয়ের প্রত্যাঘাতের জন্য নিহতদের পরিজনেরা প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়েছেন। নিহত সন্তোষ জগদালের কন্যা আসাভরী জগদালে বলেছেন, ‘আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছে। আমাদের চোখের জলের বাঁধ মানছে না।’ কেরালার এম রামচন্দ্রনের কন্যা আরতি মেনন বলেছেন, ‘আমাদের ক্ষতি অপুরণীয়। তবে আজ আমরা গর্বিত। দু’হাত জোড় করে মোদীকে ধন্যবাদ জানাই।’ কানপুরের শুভম দ্বিবেদীর স্ত্রী অশন্যা দ্বিবেদী বলেছেন, ‘আমার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের গোটা পরিবার সেনাবাহিনী ও তাঁর ওপর আস্থা রেখেছিল।’

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্যে বিরোধী দলের নেতারাও একযোগে সমর্থন জানিয়েছেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সেনার সাহসিকতাকে সম্মান জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আমি গর্বিত। জয় হিন্দ।’ এছাড়া কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস মুখপাত্র জয়রাম রমেশ, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব, শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, তেজস্বী যাদব, এআইএমআইএম নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি-সহ সকলেই ভারত সরকার এবং সেনাবাহিনীর পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

পাকিস্তানকে সফল প্রত্যাঘাতের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাধুসন্তরাও উচ্ছ্বসিত। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের আইকন, পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজের মতে, ‘ধর্ম রক্ষার্থে আর হিন্দুদের রক্ত যে ব্যর্থ হবে না, সেটা বুঝিয়ে দিলেন মোদী।’ এছাড়া অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির রাজ্যশাখার মহাসচিব ব্রহ্মবিদ্যানন্দজী, পশ্চিমবঙ্গ দণ্ডীস্বামী পরিষদের সভাপতি রামানন্দ দণ্ডস্বামী, সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের যুগ্ম সম্পাদক জগদার্তিহা দাসপ্রভু প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের লেখিকা দেশত্যাগী তসলিমা নাসরিন মন্তব্য করেছিলেন— ‘যতদিন বিশ্বে ইসলাম থাকবে ততদিন সন্ত্রাসবাদও থাকবে।’ তাঁর এই কথার সূত্রে এখন অনেকেই বলছেন, ‘বিশ্ব মানচিত্রে যতদিন পাকিস্তান নামক দেশটি থাকবে ততদিন সন্ত্রাসবাদ থাকবে।’ তাই এই সন্ত্রাসী দেশটাকে অতি সত্বর মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া দরকার।

পাকিস্তানের হৃদ্‌কম্প বাড়িয়ে বালুচিস্তান প্রদেশে বালোচ স্বাধীনতাকামীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর মধ্যেই বালোচ লিবারেশন আর্মি বালুচিস্তান প্রদেশের বোলান ও কেচ অঞ্চলে দুটি পৃথক হামলা চালিয়ে ১৪ জন পাক সেনাকে খতম করেছে। এছাড়া বালোচরা কোয়েটা-সহ কয়েকটি শহর দখল করে সেখান থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বালোচ পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং জাতিসঙ্ঘে বালুচিস্তানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য আবেদন করেছে। উপরন্তু ভারতের কাছেও স্বীকৃতি চেয়েছে।

পাকিস্তানে সফল প্রত্যাঘাতের জন্য ভারতের দুই নারীশক্তি— ভারতীয় সেনার সিগন্যাল কর্পের আধিকারিক কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহকে তাঁদের দেশভক্তি ও সাহসিকতার জন্য ভারতবাসী উচ্ছ্বসিত ভাবে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। জয় হোক নারীশক্তির, জয় হোক ভারতমাতার।

সরস্বতী কূপই ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রমাণ

দুর্গাপদ ঘোষ

কোটি কোটি সনাতনী হিন্দুর পরম্পরাগত বিশ্বাস হলো প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে সরস্বতী নদী। প্রথাগতভাবে ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রাচীনকাল হতে চলে আসা এই ধারণার সারবত্তা অলঙ্ঘনীয় হলেও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায় যে এই সরস্বতীই কি বর্তমানে অদৃশ্য তথা অন্তঃসলিলা বৈদিক নদী সরস্বতী! এক শ্রেণীর ভূতত্ত্ববিদের বক্তব্য, এই সঙ্গমে কেবল গঙ্গা ও যমুনা নদী মিলিত হয়েছে। এর সঙ্গে সরস্বতীর জলধারার সম্পর্কের বিষয়টি ভিত্তিহীন। বাস্তব হলো, সরস্বতী নদী তথা তৃতীয় কোনো জলপ্রবাহের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলে প্রাচীনকাল থেকে এই পবিত্র ও পুণ্যস্থানকে 'ত্রিবেণী সঙ্গম' বলা হতো না। এক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন জাগে ত্রিবেণী সঙ্গমের সঙ্গে কি বৈদিক নদী সরস্বতীর সত্যিই সম্পর্ক নেই? ত্রিবেণী সঙ্গমের সঙ্গে সরস্বতী নদী সম্পর্ক-বর্জিত নয়, এটা কীভাবে সম্ভব?

পুরাণ থেকে আমরা জানতে পারি যে কুম্ভ-মহাকুম্ভ মেলার জন্য নির্ধারিত এই ভূমিখণ্ড আদতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার তপোভূমি। এখানে গোলোকাধিপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ব্যবস্থাপনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সময় প্রজাপিতা ব্রহ্মা জগৎ (পৃথিবী) সৃষ্টি করেন। কিন্তু এত সুন্দর জগৎ সৃষ্টির পরও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা রীতিমতো বিমর্ষ। কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত। সৃষ্টি সুখের আনন্দে তাঁর যখন উৎফুল্ল, উদ্বেলিত হওয়ার কথা, তখন তাঁর মনে সুখ নেই, মুখে হাসি নেই। কারণ কী, না সূর্যের আলোয় জগৎ আলোকিত হলেও জ্ঞানালোকের অভাবে সবকিছু কেমন যেন অন্ধকার। পুনরায় ধ্যানে বসলেন তিনি এবং ধ্যানভঙ্গের পর তাঁর কমণ্ডলু থেকে কিছুটা জল ঢেলে দিলেন মাটিতে। অমনি তাঁর সামনে প্রকটিত হলেন এক দিব্য মূর্তি। তাঁর এক হাতে পুস্তক, অন্য হাতে বীণা। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সঙ্গীতাদির মূর্ত দেবী সরস্বতী। বিমর্ষভাব কেটে গিয়ে হাসি ফুটল ব্রহ্মার মুখে। প্রফুল্ল বদনে তিনি অন্তর্ধান করলেন। আর সেই দেবী কলতান মুখরিত হয়ে এগিয়ে গিয়ে মিলিত হলেন গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে। বেণীর মতো তিন জলধারা মিলে রূপায়িত হলো 'ত্রিবেণী সঙ্গম'।

দুই বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ পুরী এবং ভার্মা তাঁদের গবেষণায় প্রমাণ করেছেন, প্রায় ২০০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিমালয়ের নীচে টেকটেনিক প্লেটের নড়াচড়ার ফলে সরস্বতী নদীবক্ষে ৩০ মিটার উঁচু বাধা তৈরি হয়েছিল। এটি বাটা-মার্কণ্ডা বিভাজন নামে পরিচিত। এর ফলে সরস্বতী তার পশ্চিমমুখী গতিপথ পরিবর্তন করে পূর্বদিকে মোড় নেয় এবং প্রয়াগরাজের কাছে গঙ্গা-যমুনার প্রবাহে মিলিত হয়। (Puri,V.M.K and B.C. Verma. 1998. Glaciological and Geologocal Source of the Vedic Sarasvati in the Himalayas . Itihas Darpan, Vol, IV, No. 2, pp.7-36. B.B Lal, Testing Ancient Indian Traditions. 2017.)। কালের গতিতে সেই সরস্বতী বর্তমানে দৃশ্যমান নেই। কিন্তু অন্তঃসলিলা হয়ে এখনও সঙ্গমে মিলিত হচ্ছে। এটা যে কেবল একটা পৌরাণিক ধারণা অথবা কেবল কল্পকাহিনি (মাইথোলজি), তা নয়। মাত্র ৮-৯ বছর আগে রীতিমতো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে সঙ্গমস্থল থেকে ১.৫ কিলোমিটার মতো দূরে অবস্থিত সরস্বতী কূপ এবং তাকে কেন্দ্র করে নির্মিত সরস্বতী মন্দিরস্থল থেকে একটি অতিপ্রাচীন জলধারা যে মাটির তলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সঙ্গমে গিয়ে মিশছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহাহিমবন্ত হিমালয় পর্বতমালার সর্বনিম্ন স্তর শিবালিক পর্বতমালা থেকে উৎপত্তি হয়েছিল বৈদিক নদী সরস্বতীর। মহাভারতের কালে, এখন থেকে ৫ হাজার বছর আগেও সেই নদীর প্রবাহমানতার কথা জানতে পারা যায়। কুরুক্ষেত্রের অবস্থান সম্পর্কে মহাভারতে বলা হয়েছে 'উত্তরেণ সরস্বত্যা দক্ষিণেন দৃশদ্বতী...', অর্থাৎ এর মধ্যবর্তী এলাকা ছিল কুরুক্ষেত্র। সেই সময় সরস্বতী নদী কোথাও কোথাও ৮-১০ কিলোমিটারেরও বেশি প্রশস্ত ছিল। মিলিত হতো সিন্ধু সাগরে (বর্তমান নাম আরব সাগর)।

কালক্রমে তার ধারা ক্ষীণ হতে হতে পুরো নদীটিই অন্তঃসলিলা হয়ে গিয়েছে। প্রয়াত বাবাসাহেব আপ্তের স্মৃতি রক্ষার্থে গঠিত ইতিহাস সংকলন ও পুনর্লিখন সমিতির তত্ত্বাবধানে সংঘটিত বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তার অস্তিত্বের প্রমাণও মিলেছে। তার গতিপথ ছিল ত্রিবেণী সঙ্গম বা প্রয়াগরাজ থেকে বেশ কয়েকশো

কিলোমিটার দূরে। ত্রিবেণী সঙ্গমে যে সরস্বতী নদীর মিলন ঘটেছে, সেটিই হলো প্রাচীনকালের বৈদিক সরস্বতী নদী। এই নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল সারস্বত সভ্যতা। এ কারণে ত্রিবেণী সঙ্গমের সরস্বতীর মাহাত্ম্য অপরিসীম। পুণ্যস্নানার্থীদের কাছে সর্বাধিক। কারণ, তাঁদের একান্ত বিশ্বাস সঙ্গমের সরস্বতী স্বয়ং ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে সৃষ্ট।

প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি যাবতীয় কিছুর বেশির ভাগই বিধৃত হয়েছে কাব্যাশ্রয়ী গ্রন্থসমূহে এবং অনেক ক্ষেত্রে রূপক কাহিনির মাধ্যমে। এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ ও ভাব অনুধাবন করতে না পেরে অনেকে, বিশেষ করে পশ্চিমি স্কলার (বিদ্বান)-রা এগুলিকে 'মিথ' বা কাল্পনিক বলে বুঝিয়ে এসেছেন। আমরাও নির্বিচারে তা শিরোধার্য ও গলাধঃকরণ করে চলেছি। ক্রমে ক্রমে, এখন তার অনেক কিছুর স্পষ্টীকরণ হচ্ছে। ত্রিবেণী সঙ্গমে সরস্বতীর জলধারা সংক্রান্ত কিছু পৌরাণিক ধ্যানধারণা রয়েছে। পশ্চিমি স্কলাররা এই স্থানে সরস্বতীর মিলনকে 'মাইথোলজি' বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ফলে তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদীরা ভারতের প্রচলিত ধারণাকে বহু বছর ধরেই অস্বীকার করে চলেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আস্থার বিষয়টি তাদের কাছে সহজগ্রাহ্য নয়। যদিও প্রকৃত বাস্তবটা সকলেই জানতে চায়। এটা স্বাভাবিক ও উচিতও।

এবারের মহাকুম্ভে এ বিষয়ে অনেকটা আলোকপাত করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের ধর্ম বিষয়ক শিক্ষক সুবেদার মেজর রামনারায়ণ পাণ্ডে। তিনি ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে দেড় কিলোমিটার মতো দূরে অবস্থিত এলাহাবাদ ফোর্ট ও অক্ষয় বটের কাছেই যে সরস্বতী কূপ মন্দির রয়েছে তার প্রধান পুরোহিত। তাঁর কথা অনুযায়ী মাটির তলা থেকে এই সরস্বতী কূপে যে জল জমা হচ্ছে তার মূল উৎস হলো উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার একটি পাহাড়ি গ্রাম। 'মানা' নামের ওই গ্রাম বদ্রীনাথ এলাকা সংলগ্ন। ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে দূরত্ব প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার। আগে এই গ্রামকে চীন সীমান্তের দিকে 'ভারতের শেষ গ্রাম' বলা হতো। সে পরিচয় বদলে দিয়ে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই গ্রামটিকে চীন সীমান্ত থেকে 'ভারতের প্রথম গ্রাম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেখান থেকে আগত এই জলধারা কোথাও দৃশ্য, কোথাও অদৃশ্য বা অন্তঃসলিলা হয়ে প্রয়াগরাজের সরস্বতী কূপ হয়ে সঙ্গমে গিয়ে মিশছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত বিষয়ে স্নাতক সুবেদার পাণ্ডে এই বিষয়ে মনোরম একটি কাহিনি শুনিয়েছেন। অষ্টাদশ পুরাণ রচনার সময় মহর্ষি বেদব্যাস— পদ্ম, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, নারদ, স্কন্দ, মৎস্য, বায়ু, গরুড় ইত্যাদি পুরাণের কথা বলে যেতে থাকেন এবং লম্বোদর শ্রীগণেশ তা চার হাতে লিখে যেতে থাকেন। মাঝে মাঝে শ্রীগণেশ মহর্ষি বেদব্যাসের কথা ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছিলেন না সরস্বতীর প্রবাহের কলতানের জন্য। ক্ষণে ক্ষণে শ্রীগণেশের মনোঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটছিল। সরস্বতীকে তখন পাতাললোকে প্রবেশ করে প্রয়াগরাজের সঙ্গমের দিকে প্রবাহিত হওয়ার প্রার্থনা জানানো হয়।

সেইমতো নদীতমে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হলে প্রয়াগরাজের দ্বারপাল তথা রক্ষক বেণীমাধব (যিনি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু) দেবী সরস্বতীকে বলেন যে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ না করলে সকলে তাঁর অস্তিত্বের কথা ভুলে যাবেন। সেইমতো সরস্বতী মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে সঙ্গমের দিকে এগোতে থাকেন।

বলা বাহুল্য, কোনো জলধারার কোথাও ভূতলে আবার কোথাও ভূগর্ভে অন্তঃস্রোত হয়ে প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টি ভূ-তাত্ত্বিক তথা ভূ-বৈজ্ঞানিক ঘটনা। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান তথা ইতিহাসাদির অনেক কিছুই রূপক কাহিনির মোড়কে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। মানা গ্রাম থেকে ত্রিবেণী সঙ্গম পর্যন্ত এই জলধারা যে কোথাও কোথাও মাটির উপরে এবং কোথাও কোথাও মাটির তলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ভূ-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার প্রমাণ পেয়েছেন। ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে চীনা পর্যটক হিউ-এন-সাং যখন প্রয়াগের কুম্ভমেলায় এসেছিলেন। তখন তিনি মৎস্য পুরাণের 'প্রয়াগ মাহাত্ম্য' অংশে, রামায়ণে ও মহাকবি কালিদাস রচিত রঘুবংশমে উল্লেখিত অক্ষয় বট এবং পুরাণে বর্ণিত সরস্বতী কূপের ওই স্থান থেকে একটি ক্ষীণ জলধারা সঙ্গমের দিকে বয়ে যেতে দেখেছিলেন বলে তাঁর বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সম্ভবত তার পরবর্তীকালে সেই ধারা অন্তঃসলিলা হয়ে যায়। এখন যে কূপে সেই জল মিলিত হচ্ছে, তাকেই ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল থেকে আবির্ভূতা সরস্বতীর পরিচয় অনুসারে 'সরস্বতী কূপ' বলে আখ্যায়িত করে পবিত্র জ্ঞানে আরাধনা করা হয়ে থাকে।

তবে এই কূপ থেকে সঙ্গম পর্যন্ত যে একটা ভূগর্ভস্থ জলধারা বয়ে চলেছে, ২০১৬ সালে ভূ-বিজ্ঞানীরা তার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। রূপকাকারে বিধৃত প্রাচীন বর্ণনা অনুসরণ করে তাঁরা সে বছর একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালান। জলের মধ্যে পুরোপুরি দ্রবীভূত না হওয়া একটি রাসায়নিক রঙের কিছুটা তাঁরা ঢেলে দেন সরস্বতী কূপের মধ্যে। তারপর রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিতে উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি কিছুদূর অন্তর অন্তর বোরিং করে জলের নমুনা পরীক্ষা করে যেতে থাকেন। তাঁরা দেখতে পান যে, সরস্বতী কূপ থেকে সেই রং ক্রমে ক্রমে জলের ধারার সঙ্গে 'সঙ্গম নোজ'-এর দিকে এগিয়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্গমে এসে মিলিত হচ্ছে। অর্থাৎ, ত্রিবেণী সঙ্গমের সঙ্গে বৈদিক নদী সরস্বতীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এক্ষেত্রে প্রমাণিত। মানা গ্রাম থেকে উৎপত্তি হওয়া সরস্বতী নদীর ঘটেছে প্রয়াগরাজের সরস্বতী কূপে এবং এই কূপ থেকে নির্গত জলধারা এখনও মিলিত হয়ে চলেছে ত্রিবেণী সঙ্গমে। সুতরাং ত্রিবেণী সঙ্গম কেবল সনাতনী হিন্দুদের পৌরাণিক জ্ঞানপ্রসূত আস্থা বা বিশ্বাসই নয়, বাস্তবিকভাবেও গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন নদীর সঙ্গমস্থল, যে তিন নদীকে ভারতবর্ষে তিনটি বেণীর উপমায় আবহমান কাল ধরে ভূষিত করা হয়েছে। □

অমর্ত্য সেন কিছু বলুন—নীরব কেন?

বিজেপি শাসিত রাজ্যে যদি কোনো অঘটন ঘটে, তখন দেখেছি অমর্ত্য সেনকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করতে, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলছে তার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত সেনমশাই কোনো কথা বলেননি। কেন? সেনমশাই আপনি দেখতে, শুনতে পাচ্ছেন কি মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের আর্তনাদ? বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে, আপনি একটি কথাও বলেননি। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা, মোথাবাড়ি, সুতী, জঙ্গিপুরে এই যে ঘটনা ঘটালো তৃণমূলনেত্রীর দুধেল গাইয়েরা, সেই ব্যাপারে সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির বক্তব্য কি আপনি শুনেছেন? হুমায়ুন কবীর বলেছেন ৩০ শতাংশ হিন্দুকে কেটে ২ ঘণ্টার মধ্যে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবেন, আপনি শুনেছেন কি? যদি শুনে থাকেন তবে, প্রতিবাদ করেননি কেন? দিদির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে এই ভয়ে?

বিজেপি শাসিত রাজ্যে যদি মুর্শিদাবাদের মতো ঘটনা ঘটত, তবে সেনমশাই শুনতে ও দেখতে পেতেন।

—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,
দেবী বাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

প্রশ্নের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা

এই কথাটা কেউ বলছে না যে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করে পাকিস্তান হলো 'মুসলমান দেশ' কিন্তু ভারত 'হিন্দুরাষ্ট্র' না হয়ে কী করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হয়ে গেল? আবার ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় কেন 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি বি আর আম্বেদকর লিখলেন না? এরপর যে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার থাকে, সেখানে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যোগ করা কেন হলো? তা যদি হলো তাহলে 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার'-এর গুরুত্ব বাড়ল না কমল? হিন্দু মন্দিরের প্রণামিতে সরকার মাথা গলায়, হিসাবে নেয় অথচ মানুষের দান করা ইসলামি উপাসনা স্থানের অর্থ-সহ সম্পত্তির কোনো হিসেব সরকার নেয় না। কেন? আবার হিন্দুধর্ম ছাড়া মুসলমানরা তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মজহবি শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষা দিতে পারবে না। কেন? একই দেশে দুইরকম নিয়ম কেন তা বুঝতে পারছি না? হিন্দু দেখে দেখে হত্যা করাটা দোষের নয়, শুধু সিকিউরিটি ছিল না সেটাই বিচার্য? হ্যাঁ এটা ঠিক সিকিউরিটিতে গাফিলতি ছিল, এটা অবশ্যই ভুল ছিল, তাহলে প্যান্ট খুলে দেখে দেখে স্ত্রী ও মহিলাদের সামনে হত্যা করবে, এটা দোষের নয়? এখানে কোন 'মানবিকতা' প্রকাশ পাচ্ছে সত্যিই বুঝতে পারলাম না। একই দেশে একরকম সিলেবাস হবে না কেন? জনপ্রতিনিধিরা ৫ বছর এমএলএ, এমপি হওয়ার পর কী করে পেনশন পেতে পারে? ভারতবর্ষে সবকিছুই সংবিধান অনুযায়ী হয়, তাহলে সেটা সিলেবাসে পাঠ্য করা হচ্ছে না কেন? ডব্লুবিসিএস অফিসার এবং ডিএম, এসপি হতে গেলে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করে আসতে হয়, অথচ জনপ্রতিনিধি হতে গেলে বয়স ছাড়া কোনো শিক্ষাগত কোনো যোগ্যতার দাবি স্বাধীনতার ৭৫ বছরে কেউ তুললো না? সত্যি বুঝতে পারছি না। এত তাবড় তাবড় জনদরদী দলের নেতা ও সাংবাদিকরা কি করছে?

—মৃণাল মজুমদার,
বার্লিন, জার্মানি।

পশ্চিমবঙ্গে সনাতন হিন্দু রক্ষায় চাই উপযুক্ত কৌশল

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রভাবে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা এখন এক রকমের ইসলামিক জেহাদি শক্তির কেন্দ্র। বাকি জেলাগুলির নলিয়াখালি, সন্দেশখালি, ক্যানিং, ধুলাগড় প্রভৃতি স্থানে জেহাদিদের তাণ্ডবের কথা সবাই জানেন। তৃণমূলের শাসনকালে এরাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালির পদবি হিন্দুর হলেও তারা কার্যত তাঁরা নিষ্প্রাণ জড়বস্তুতে পরিণত হয়ে রয়েছেন। জেহাদিরা প্রশাসনের সর্বত্র ঢুকে পড়েছে—পুলিশ, শিক্ষাঙ্গন, কলেজ ইউনিয়ন, ড্রাইভার, ফুটপাথ ব্যবসায়ী, হাসপাতালের দালাল, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তর সর্বত্র তাদের প্রভাব বিরাজমান। আর একটি বিশেষ কৌশল তৃণমূল দল তৈরি করেছে, তা হলো হিন্দুদের আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল করে রাখা। শিল্প নেই, চাকরি নেই, আছে শুধু ভাতা। কোনো কাজ না করে শুধু বসে বসে ভাতা পাওয়ার লোভে এক বিপুল সংখ্যক হিন্দু এই সরকারের পদলেহন করে চলেছে। আর আছে কাটমানি। সরকারি প্রকল্পের টাকা থেকে ইচ্ছে করে কাটমানি নেবার সুযোগ করে দিচ্ছে নেতা-মন্ত্রীরা। মানুষকে কর্মহীন করে রাখা হচ্ছে যাতে তারা তৃণমূল দলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এমনকী ক্লাবগুলোকেও পূজার অনুদান দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছে। এ বিরাট এক ষড়যন্ত্র।

তৃণমূলের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছে জেহাদি শক্তির প্রবেশ পথ। প্রতিটি ভোটে দেখা যাচ্ছে সীমান্ত এলাকার জেলাগুলিতে এই জেহাদিদের তাণ্ডব। এতকিছু দেখেও হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ নয়। তাই আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে কৌশলে লড়তে হবে। (১) চাই গোপনীয়তা— সব রণকৌশল মিডিয়ার সামনে বলা উচিত হবে না। ভোটের আগে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা কেস দিয়ে ফঁসিয়ে দেওয়া হয়। তাই সাবধান থাকতে হবে। কর্মীদের সোশ্যাল মিডিয়াতেও সংযত থাকতে হবে। (২) সুরক্ষা--- বিজেপি কর্মীদের সর্বপ্রকার সুরক্ষার পথ অবলম্বন করতে হবে।। সচেতনতা--- মানুষকে সচেতন করার জন্য চলচ্চিত্রের ভূমিকা রয়েছে। তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন ধরনের চুরি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সিনেমার মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। সিনেমা করার কথাটা অদ্ভুত শোনালেও বাস্তবে খুবই প্রয়োজন, কেননা শাসকদলের উচ্ছিষ্টভোগী মিডিয়াগুলি সত্য

ঘটনা চেপে যায়। তাছাড়া বামপন্থীরা সবসময় মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। মিথ্যার মুখোশ খুলে দেওয়া সিনেমা এরাজ্যের হলগুলিতে চলতে দেওয়া হবে না, এটা জানা কথা। তাই কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে সমস্ত ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং ইউটিউব বা অন্যান্য মাধ্যমে সহজলভ্য প্রচার চালাতে হবে। সান্ধ্যকালীন প্রচারপর্বে গ্রামের মাঠে লার্জস্ক্রিনে তা দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের প্রচার নিশ্চিতভাবে আইপ্যাকের প্রভাবকেও নিষ্ক্রিয় করে দেবে। (৪) বুথ পাহারা— বিজেপি কর্মীদের মনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী কিন্তু সেনা নয়। ভোটের সময় তাদের কাজ করতে হয় রাজ্য প্রশাসনের অধীনে। প্রশাসন কেন্দ্রীয় আধা সেনাকে নিয়ে ছেলেখেলা করে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কোনোভাবে উচ্চ পদের সেনাকর্তাদের অধীনে রেখে কাজ করানো যায় কিনা ভাবতে হবে। এটা না করতে পারলে ভোটের দিন এবং ভোট গণনায় যে ২০২১-এর পুনরাবৃত্তি হবে তা বলাবাহুল্য।

—**কমল কবিরাজ**,
কলকাতা-৬।

ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে পড়ছে!

কংগ্রেসিরা, ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে পড়ছে বলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খোঁচা দিতে শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য ইন্দিরা গান্ধী বীরাঙ্গনা আর নরেন্দ্র ভীরু। তাই দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে পড়ছে। সে ওদের মনে পড়তেই পারে। কারও মনকে তো আর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। আমাদের তো বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সেই ১৯৭১ সালের কথা মনে পড়ছে। সেদিন আমরা কী পেয়েছি আর কী কী হারিয়েছি। এটা ঠিক যে দেশের বিরোধী দলের সমর্থন ইন্দিরা গান্ধী পেয়েছিলেন। বিরোধী নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি তার দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ করে কর্মীদের দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'আজ এক দেশ, এক জাতি আর এক নেত্রীর নেতৃত্বে যুদ্ধ করছে।'

সেই যুদ্ধে ভারতের জয় হয়েছিল। তিরানব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে পাক জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। আমাদের আটচল্লিশ জন বিমানবাহিনীর অফিসার পাকিস্তানের হাতে বন্দি হয়েছিল। আমাদের কয়েকশো সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা পাকিস্তানকে ভেঙে বাংলাদেশ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা কিন্তু তা চাইনি। দেশের জনগণের ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশকে ভারতভুক্তি করা। তখন ইন্দিরা গান্ধীর তীব্র বাসনা ছিল ও লক্ষ্য ছিল নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জন করা। তাই বাংলাদেশের ভারতভুক্তি হয়নি। তিরানব্বই হাজার পাকসৈন্য বন্দির বিনিময়ে সেই দিন পাক-অধিকৃত কাশ্মীর দাবি করলে পাকিস্তান তা মানতে বাধ্য ছিল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী তা করেননি। তিনি পাক সৈন্যদের বিরিয়ানি খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী আমাদের আটচল্লিশ জন বিমান বাহিনীর অফিসারদের ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেননি। পাকিস্তান তাদের অত্যাচার করে হত্যা করে। আর আমাদের রক্তের বিনিময়ে সেই স্বাধীন বাংলাদেশ আজ মুসলমান দেশ হয়ে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে হিন্দু গণহত্যা করে চলেছে। এসব ইন্দিরা গান্ধীর ভুল ও নোবেল শান্তি পুরস্কারে লোভের ফলেই হয়েছে। সত্যি, সেই জন্য আজ আমাদের ইন্দিরা গান্ধীকে খুব মনে পড়ছে।

—**শ্যামল কুমার হাতি**,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, শান্তির জন্যে যুদ্ধ চাই

সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরাই আতঙ্কে থাকে। তাই তাদের সবসময় কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা থাকে। তারা মুখ দেখাতে ভীষণ ভয় পায় যদি মানুষ দেখতে পায়, যদি ধোলাই দেয়। রাতের অন্ধকারে, কখনো-বা দিনেরবেলায় চোরদের মতো পাকিস্তান থেকে এসে কাশ্মীরে হিন্দু পর্যটকদের উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে যা হয়েছিল আমাদের সকলের জানা হাড়হিম করা সেই সন্ত্রাসের কথা। মাদ্রাসায় তাদের মগজ ধোলাই হয়। এই জেহাদিরা আলো দেখতে ভয় পায়। অসুন্দর কখনো সুন্দরের পূজারি হতে পারে না। তাই তারা মঠ, মন্দির, গ্রন্থাগার, শিল্প-কলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ধ্বংস করতে ভালোবাসে। মানবতা বিরোধী শত্রুর নাম এই ইসলামিক জেহাদিরা। তারা ধর্মের নামে পৃথিবীকে অশান্ত করে তুলেছে। তাই ভারত সরকার সঠিক কাজ করেছে। পাকিস্তানকে দুরমুশ করে দিয়েছে। তারা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, কিন্তু শান্তির জন্যে এমন যুদ্ধ বারবার চাই। পাকিস্তান তো টাইট হলো কিন্তু যারা ভারতের ভিতরে থেকে পাকিস্তানের সাপোর্ট করছে তাদের কী হবে? বিশেষ করে সিপিএমদের, যারা পাকিস্তানের স্লিপার সেল হয়ে কাজ করছে? তারা সর্বদা ভারত বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে।

এই জেহাদিরা সর্বদা ঘৃণার বিষ ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে। তারা নিজ মজহবে সন্তুষ্ট নয়, তারা অন্যের ধর্মকে আঘাত করতে সদা ব্যস্ত থাকে। তারা নিজেদের বিশ্বাস অন্যের উপর জোরপূর্বক চাপাতে চায়। তাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন, যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন সন্ত্রাসবাদ থাকবে। এরা মসজিদে বসে মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করে। পবিত্র স্থান অপবিত্র করে আল্লার নামে। ভারতে হিন্দু, মুসলমান দুটো পৃথক জাতিসত্তা কখনো এক ছিল না, কখনো এক থাকতে পারে না। তাই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়। এখন হিন্দু-মুসলমান মেরুকরণে নির্বাচন হচ্ছে তবুও সেকুলারিজমের মুখোশ পরে থাকে নেতা-নেত্রীরা। এই মেকি, ফেক সেকুলারিজম কখনো ভারতের গণতন্ত্রের হিতসাধন করতে পারে না। এখন যেমন মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় জেহাদিরা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করছে। তাই এমন ভ্রান্ত তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে না থেকে এই ফ্রড সেকুলারিজম সংবিধান থেকে তুলে দিলেই দেশ বাঁচবে, দেশের মঙ্গল হবে।

—**সুবল সরদার**,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মনের প্রফুল্লতা ও রোগমুক্ত জীবন

মৌ চৌধুরী

সামাজিক দূরত্ব, একাকিত্ব, অর্থনৈতিক কারণ, কুচিন্তা, অশিক্ষা প্রভৃতি জন্য মানুষের জীবন থেকে আনন্দ হারিয়ে যাচ্ছে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। আর এই কারণেই মানসিক অশান্তি, আর তার জন্যই বিভিন্ন ধরনের জটিল অসুখ। রোগগ্রস্ত মানুষ নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে চিকিৎসার খরচ জোগাতে। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত বা দুর্বল বেশিরভাগ পরিবারই সুচিকিৎসার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভরসা করছে। অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি, সব ক্ষেত্রেই চেষ্টা করছে। দেখা যাচ্ছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরীক্ষা নির্ভর চিকিৎসা করেন চিকিৎসকরা। ফলে রোগীর রোগের চিকিৎসার শুরু হওয়ার আগেই চিকিৎসকের দেওয়া পরীক্ষাগুলো করিয়ে রিপোর্ট নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হচ্ছে। তাতেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক সংশয় থাকছে। ওষুধ খেয়ে রোগীর বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। ফলে আরও অনেক ধরনের সমস্যার শিকার হতে হচ্ছে। সময়, অর্থ নষ্ট করেও রোগী সুস্থ হচ্ছে না। ফলে তাদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে, অনেকেই চিকিৎসক বা চিকিৎসা পদ্ধতি পরিবর্তন করছে। মূল কথা হলো, প্রকৃতপক্ষে কেউ সুস্থ নেই। ফলে জটিলতা বেড়েই চলেছে। মানুষের মনের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং সংসার ও সমাজজীবনে তার প্রভাব পড়ছে।

দেখা যাচ্ছে প্রতিটি হাসপাতাল বা চিকিৎসকের চেম্বারে রোগীর ভিড় বেড়েই চলেছে। একজন রোগীকে অসুখের রকমফের নিয়ে তিন-চার জন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হচ্ছে। ওষুধ নির্ভর জীবন মানুষকে কখনোই শান্তি দিতে পারে না। অথচ প্রাচীন ভারতবর্ষে মানব জীবনে এত জটিলতা ছিল না। চিকিৎসা ব্যবস্থাও ছিল যথেষ্ট উন্নত। ইতিহাস সাক্ষী, ভারতের সুস্থ মানুষের শান্তিময় জীবন তাদের জীবনীশক্তিকে সর্বদা সৃষ্টিশীল কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত করেছে।

ভোগবাদের কারণে বর্তমান সময়ের মানুষ একটু শান্তির জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। শান্তির খোঁজে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করছে, সব ছেড়ে মঠ মন্দিরে আশ্রয় নিতে

অঙ্গনা

ছুটছে। যোগ, ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দেহকে রোগমুক্ত করার চেষ্টা করছে। তবুও সফলতা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাস্তব কথা হলো, শরীর ও মন দুটি আলাদা সত্তা হলেও অশান্তি চিরসাথী হলে অজান্তেই শরীরে অসুখ ঠাঁই করে নিচ্ছে।

কিন্তু প্রমাণিত সত্য যে সামান্য কিছু বংশগত ও ক্রনিক ব্যাধি ছাড়া মানুষ চেষ্টা করলে সুস্থ জীবন পেতে পারে। মনের ভেতরের কিছু অন্ধ বিশ্বাস ও কুটিলতা দূর করতে পারলে শরীর ও মন দুটোই সুস্থ থাকবে। সকলেই জানেন যে প্রফুল্লিত মনই শান্তির আধার। যোগীপুরুষ ও অনেক চিকিৎসকও মনে করেন বেশিরভাগ অসুখ সৃষ্টি করে মানুষ নিজেই। ঈর্ষা, রাগ, ক্ষোভ অপরের প্রতি প্রতিহিংসা আর অর্থের লোভ, চাহিদা, মোহ মানুষকে এক ধরনের উন্মাদ করে তুলেছে। পেশা নির্বিশেষে নারী-পুরুষ এর শিকার। একটু ভালো ব্যবহার, সহানুভূতি এখন ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে। অতিরিক্ত চঞ্চল মন নিত্য বিভিন্ন অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ছে। মনের দীনতা, কুবাক্য, ভোগের মোহে মিথ্যাচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। স্বার্থে আঘাত পড়লেই মানুষ সহজেই মনুষত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষরা বলেছেন, মন দৃঢ় করে মহান শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, শান্ত মনে মুক্তি পথের উদ্দেশ্যে আপনাকে নিবেদন করলে সার্বিক শান্তি পাওয়া যায়। এতে রোগ বালাই যেমন দূরে থাকবে, তেমনই ডাক্তার-ওষুধ-প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নির্ভর চিকিৎসার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। ওষুধের পরিমাণও অনেকটাই কমবে। অনেকেই মনে করেন যে মন যত জটিল, চাপা, স্বার্থপর রোগের বাসস্থান সেই সব দেহে বেশি।

এদিকে দিন দিন মনোরোগের সংখ্যাও বাড়ছে। মানুষ যত বেশি কুকর্ম করছে তার ফল তা ভোগ করতেই হবে। সুস্বাস্থ্যের জন্য সুস্থ ও প্রফুল্ল মন শ্রেষ্ঠ ওষুধ। কারও সর্বনাশ করা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা, নেশা ও পাপ কাজের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা, এই সব থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। মহাপুরুষদের কথামতো মনুষত্ববোধ জাগ্রত করা, নিষ্পাপ কর্মের মন ও মাধ্যমে শরীরকে পবিত্র মন্দিরে পরিণত করতে পারলে যে আনন্দ অনুভব হয় তাকে চিরস্থায়ী করলে সুস্থ শরীর লাভ হয়।

ভারতবর্ষে বহু উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল। যোগাসন ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা তার প্রমাণ। মানুষের এই জটিল দেহ রোগমুক্ত হোক, নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রতিটা মানুষ সচেতন হোক, কুঅভ্যাস ত্যাগ করে যোগাভ্যাস করুক। সুস্থ না থাকলে কোনো কাজ ভালোভাবে করা যায় না। তাই মনের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। মনের প্রফুল্লতা রোগ মুক্তির সহায়ক। মনকে যে যতটা কুচিন্তা মুক্ত করে রাখবে তার মধ্যে ভালো ইচ্ছা শক্তি তত বেশি কাজ করবে। সুস্থ শরীর ও সঠিক শিক্ষা একটি দেশের উন্নতির সোপান। রোগ মুক্তির জন্য চিন্তামুক্ত মন অবশ্যই দরকার। তাই তো গুরু কল্পনায় নিত্য উপাসনায় মনকে পবিত্র করতে সান্ধ্য প্রার্থনায় গাওয়া হয়— 'জয় সদগুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভব রোগ বিকার বিনাশক হে'। মনে রাখতে হবে, নারীসমাজ সুস্থ ও সবল থাকলেই আগামী প্রজন্মও সুস্থ ও সবল হবে। ◻

সানস্ট্রোক থেকে বাঁচুন

ডাঃ বলরাম পাল

প্রথমেই বলে রাখি সানস্ট্রোককে হিটস্ট্রোকও বলা হয়। তবে সানস্ট্রোককে কিন্তু কোনো রোগ বলা যায় না। অত্যধিক তাপের প্রভাবে দেহের তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় এবং তার ফলে শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখার যে স্বাভাবিক প্রণালী তা ব্যাহত হয়। প্রখর রৌদ্রের কারণে তপ্ত পরিবেশের ফলে যখন কোনো ব্যক্তির দেহের তাপমাত্রা 105^0F বা 40.6^0C-এর অধিক হয় তখন তার সানস্ট্রোক বা হিটস্ট্রোক হতে পারে। এখানে মনে রাখা দরকার, শরীরে সংক্রমণের জন্য যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাকে জ্বর বলা হলেও হিটস্ট্রোক কিন্তু জ্বর নয়।

সানস্ট্রোকে তিন ধরনের emergence হতে পারে।

১. Heat cramp।

২. Heat exhaustion (নিরতিশয় ক্লান্তি বা অবসাদ)।

৩. Heatstroke-ই হলো সবচেয়ে বিপদের কারণ, এতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সানস্ট্রোকের লক্ষণ :

১. High body temperature (105^0F বা 40.6^0C-এর বেশি)

২. প্রচুর ঘাম যা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ শরীর থেকে আর ঘাম হচ্ছে না, এক্ষেত্রে বুঝতে হবে Severe dehydration হয়ে গেছে। দেহের চামড়া যেন শুকিয়ে গেছে। এদিকে ঘাম যদি না হয় তবে দেহ ঠাণ্ডা হবে না, body temperature বাড়তে থাকবে।

৩. Accelerated (দ্রুততর) heart beat হবে।

৪. Hyperventilation অর্থাৎ rapid breathing, shallow panting (উপর্যুপরি হাঁপানি) বা breathlessness (উর্ধ্বশ্বাস) দেখা দেবে।

৫. হাত পায়ে খিল ধরা বা খিঁচুনি হয়।

৬. দেহের চামড়া উত্তপ্ত, শুকনো এবং লাল হয়ে যায়।

৭. গা বমি-বমি ভাব, আবার কখনো বমিও হতে পারে।

৮. প্রস্রাব ঘোলাটে বা লালচে হতে পারে।

৯. এগুলি ছাড়াও স্নায়ুতন্ত্রের উপরও কিছু প্রভাব পড়ে, যেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতো অবস্থা, coordination problems বা সমন্বয়ের অভাব, ভারসাম্য হারানো মাথার যন্ত্রণা বা মাথা ঘোরা, মাথার মধ্যে যেন একটা শূন্যতা অনুভব হয়।

১০. রোগীর মধ্যে একটা উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং একটা অসঙ্গত আচরণ লক্ষ করা যায়। রোগী অচৈতন্যও হয়ে যেতে পারে।

সানস্ট্রোকের প্রবণতা :

বয়স্ক মানুষ ও শিশুদের যেমন সানস্ট্রোক হতে পারে তেমনই তরুণ যুবক যারা বদ্ধ ঘরে ব্যায়াম করেন বা young athletes, outdoor labour বা military personnel যাদের গরমকালে তপ্ত রোদে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সানস্ট্রোক হবার প্রবণতা যেমন বেশি তেমনই নির্দিষ্ট কিছু রোগ যেমন Hypertension, Diuretics (প্রস্রাব বাড়াবার ঔষুধ), Psychiatric Drugs, Asthma, ঘুমের সমস্যা ইত্যাদির জন্য অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ব্যবহারকারীদের সানস্ট্রোক হবার প্রবণতা থাকে। অতিরিক্ত মোটা লোকেদেরও সানস্ট্রোক হতে পারে।

সানস্ট্রোক প্রতিরোধের উপায় :

সানস্ট্রোকের প্রবণতা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। দুপুরবেলা তপ্ত রোদ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা, ছাতা, টুপি ও সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। যাতে dehydration না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত জল খেতে হবে। হালকা ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে যাতে ঘাম নির্গত হতে অসুবিধা না হয় এবং দেহ ঠাণ্ডা থাকে। দিনেরবেলা strenuous exercise না করাই ভালো এখানে বলে রাখা দরকার ডিহাইড্রেশন হলেই যে পিপাসা থাকবে তা কিন্তু নয়। তাই জল পিপাসা নির্ভরযোগ্য লক্ষণ নয়, তবে প্রস্রাবের রং ঘোলাটে বা লালচে ভাব হলে সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত। উল্লেখ্য মদ্যপান এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

চিকিৎসা এবং ব্যবস্থাপনা :

● আগেই বলেছি সানস্ট্রোক হলো একটা মেডিকেল এমার্জেন্সি তাই সর্ব প্রথম কর্তব্য হলো একটি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে।

● তারপর রোগীকে কোনো ছাউনির তলায় নিয়ে যাওয়া এবং যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া এবং পাখা চালিয়ে দেওয়া বা বাতাস করা।

● চেষ্টা করতে হবে ঠাণ্ডা জল পান করানোর।

● ভুলেও ব্যাথা কমানোর বা জ্বর কমানোর ওষুধ যেমন ibuprofen, aspirin, paracetamol জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। ● রক্ত সঞ্চালন বাড়াবার জন্য হালকা ম্যাসেজ করা যেতে পারে। ● যদি রোগী অচৈতন্য হয়ে যায় তখন তাকে রিকোভারি পোজিশন অর্থাৎ বাম দিকে পাশ ফিরিয়ে এমন ভাবে শুইয়ে দিতে হবে যাতে রোগী বমি করলেও শ্বাস নালীতে কোনো বাধা না হয়। ● হাসপাতালে স্থানান্তরের আগে corebody temperature ফিরিয়ে আনা বা দেহ শীতল করার জন্য কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যেমন :

Radiation : রোগীকে এসি রুমে নিলে body heat radiate করবে এবং দেহ দ্রুত ঠাণ্ডা হবে।

Convection : অর্থাৎ ঠাণ্ডা বাতাস বা ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে দেহ ঠাণ্ডা করা যেতে পারে।

Conduction : Ice bag (বগলে, কোলভাগে, ঘাড়ে, পিঠে) ব্যবহার করলে দেহের তাপমাত্রা সঞ্চালিত হতে পারে।

Evaporation : হালকা ঠাণ্ডা জল দেহে স্প্রে করে পাখা চালিয়ে দিলে জল evaporate করবে এবং দেহ ঠাণ্ডা হবে।

সানস্ট্রোকের সম্ভাব্য complication হলো Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) যা কিনা জীবনঘাতী হতে পারে। আবার কোনো কোনো জার্নাল Multi Organ System Failure-কে complication হিসেবে দাবি করে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মত সানস্ট্রোক যদি দ্রুত এবং ঠিকঠাক না করা যায় সেক্ষেত্রেও হার্ট অ্যাটাক এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

পথে ঘাটে এই সানস্ট্রোক বা হিটস্ট্রোক আক্রান্ত রোগী দেখা গেলে সময় নষ্ট না করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হলে একটি অমূল্য জীবন বাঁচানো যেতে পারে। □

স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রণী সেনানী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

প্রণব দত্ত মজুমদার

বঙ্গ প্রদেশে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বাড়তে থাকায় ইংরেজ সরকার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যায় ১৯১২ সালে। ঠিক হলো, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ মহা জাঁকজমক করে হাতির পিঠে মণিমুক্তা খচিত হাওদায় বসে, রাজছত্র শোভিত হয়ে, সস্ত্রীক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে লালকেল্লার দরবারে গিয়ে বসবেন। দেশীয় সামন্ত, রাজা, মহারাজা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা সভা আলো করে বসবেন এবং বড়লাটের প্রতি তাঁদের সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। বড়লাট সাহেবও তাঁদের যথোচিত উপহার ও খেতাব প্রদান করবেন সম্রাট যেমন করে থাকেন। প্রজারা রাস্তায় জমায়েত হয়ে তাঁর শোভাযাত্রা অবাক বিস্ময়ে দেখবেন। সিপাই শাস্ত্রী দিয়ে সুরক্ষার বিপুল বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য ব্রিটিশ রাজশক্তির অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন এক বাঙ্গালি বিপ্লবী।

বড়লাট যখন সস্ত্রীক হাতির পিঠে চেপে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে দিল্লির চাঁদনিচকের রাস্তা ধরে তাঁর সভাস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন সেখানে শোভাযাত্রা দেখার জন্য রাস্তার ধারে মানুষের সারি, আশেপাশের বাড়ির বারান্দায়, ছাদে মানুষের ভিড়। রাস্তার ধারে কাটরাধুলিয়ার কাপড়চোপড়ের পাইকারি বাজার আছে, সেখানেও শোভাযাত্রা দেখার জন্য নারী-পুরুষের ভিড়। ওখানে রাস্তার ধারে একটি বিল্ডিঙের একতলায় পুরুষদের ভিড়; আর দোতলায় সব আশেপাশের মেয়েবউরা ভিড় জমিয়েছিল সস্ত্রীক বড়লাট সাহেবকে দেখার জন্য। বড়লাটসাহেবের শোভাযাত্রা সেই বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন দোতলায় মেয়েবউদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল তাঁদের একটু ভালো করে দেখার জন্য। অন্য কারুর দিকে নজর দেওয়ার মতো অবকাশ

তখন তাদের ছিল না। সেই সময় সকলের অলক্ষ্যে অল্পবয়সি সুন্দরী এক তরুণী তাঁর অঙ্গবস্ত্রের ভিতর থেকে বোমা বের করে ছুঁড়লেন বড়লাট হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে। তীব্র শব্দে ফাটল সেই বোমা। চারিদিকে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাহুত মারা গেল। বড়লাট অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। সিংহাসনে বসার বদলে ডাক্তারের টেবিলে শায়িত হলেন তিনি। চারিদিকে চিৎকার চেঁচামেচি হুড়োহুড়ির মধ্যে কেউ কিছু বোঝার আগেই সেই সুন্দরী তরুণী এবং তার সঙ্গী জনতার ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন। কে বা কারা এই ভয়ানক কাণ্ড ঘটাল অনেকদিন পর্যন্ত পাগলা কুকুরের মতো ঘুরেও ব্রিটিশ পুলিশ তার হদিশ করতে পারল না।

ওই ছদ্মবেশী তরুণের নাম— বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গী যাঁর পরিকল্পনায় এবং নেতৃত্বে ঘটেছিল এই ভয়ানক ঘটনা তিনি আর কেউ নন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন; কিন্তু এই অসম্ভব বুদ্ধিমান বিপ্লবীনায়ককে ব্রিটিশের ধুরন্ধর গোয়েন্দা পুলিশ কোনোদিন গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। তিনি পরে জাপানে আত্মগোপন করে তৈরি করেছিলেন 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' এবং 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' বা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। পরবর্তীকালে যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পুরো এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনে তিনি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাপান সরকার তাঁকে জাপানের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছেন; অথচ এই মহান বিপ্লবীর কথা খুব কমই হয় আলোচনা করেছেন তথাকথিত ঐতিহাসিকরা আমাদের দেশে।

১৮৮৬ সালের ২৫ বর্ধমানের প্রত্যন্ত গ্রাম সুবলদহে রাসবিহারীর জন্ম। পিতার নাম বিনোদবিহারী বসু, পিতামহ কালীচরণ বসু। শিশুবয়সেই মাতৃহারা হন রাসবিহারী। পিতা সিমলায় সরকারি প্রেসে করণিকের চাকরি করতেন। পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং ফরাসি উপনিবেশ চন্দনগরে একটি বাড়ি কিনে সেখানে পরিবারকে পাঠিয়ে দেন বসবাসের জন্য। পিতামহ, পিতামহী এবং অত্যন্ত স্নেহময়ী বিমাতার কাছে থেকে চন্দননগরে মানুষ হতে থাকেন রাসবিহারী। ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম, কুস্তি, সাঁতার ইত্যাদি শরীরচর্চার মাধ্যমে দৈহিকভাবে বলশালী হয়ে উঠেছিলেন। মাতৃহীন দামাল দুরন্ত ছেলে, চারিদিকে ঘুরে বেড়ান, নানান লোকের সঙ্গে মেশেন। ফরাসি কলোনি হওয়ার সুবাদে বহু বিপ্লবীর গোপন ডেরা ছিল চন্দননগরে। সেসব জায়গায় যাতায়াত বাড়ে তাঁর। চারুচন্দ্র রায়ের বিপ্লবী সংগঠন সুহৃদ সম্মিলনী, প্রবর্তক সঙ্ঘের বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মতিলাল রায়, শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ প্রমুখর সংস্পর্শে আসেন তিনি। শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতা হয় উত্তরপাড়া নিবাসী বিখ্যাত বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বামী বিবেকানন্দ ও

শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন রাসবিহারী। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ হয় তাঁর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার সঙ্গে দেশভক্তির চেতনা মাথাচাড়া দিতে থাকে। প্রথাগত লেখাপড়ার চাইতে দেশের স্বাধীনতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে ১৬/১৭ বছর বয়সি মেধাবী ছেলেটির কাছে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে। এইসব চিন্তাভাবনা তখন তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। উত্তর ভারতে অনেক দেশীয় রাজ্য আছে। সেরকমই কোনো একটি রাজ্যের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখবেন। এইরকম চিন্তাভাবনা থেকেই একদিন বাড়ি থেকে পালালেন রাসবিহারী। কিন্তু ট্রেনের কামরায় এক পরিচিত ভদ্রলোকের হাতে ধরা পরে গেলেন। তিনি বাড়ি থেকে পালানো ছেলেটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

ছেলের মতিগতি ভালো ঠেকছে না দেখে বাড়ির লোকেরা সিমলায় পিতার কাছে খবর দিলেন। পিতা এসে ঠিক করলেন ছেলেকে চন্দননগরে আর রাখবেন না। নিয়ে চলে গেলেন সিমলায়। ছেলের পড়াশোনা থেকে মন উঠে গেছে দেখে পিতা যেখানে চাকরি করতেন সেই সরকারি প্রেসে কপি এডিটরের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। সিমলায় চাকরি করার সময় খুব ভালোভাবে ইংরেজি শিখছিলেন তিনি, টাইপ রাইটিং ও শর্টহ্যান্ডের কাজটাও খুব ভালোভাবে শিখেছিলেন। সিমলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলেন রাসবিহারী। তিনি ধ্রুপদী সংগীত এবং বেহালা বাদনে বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। সিমলার নাট্য সমিতিতেও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ওখানকার অনেককেই মুগ্ধ করেছিল। তাঁর এই অভিনয় ক্ষমতার বলেই তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বোকা বানাতেন; ব্রিটিশের পুলিশ কোনোদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। পিতার সঙ্গে বেশিদিন তাঁর সিমলায় থাকা হলো না। কোনো এক কারণে পিতার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয় এবং সিমলা থেকে আবার পলায়ন করেন। বেশ কিছুকাল পরে পিতা-মাতা (স্নেহময়ী বিমাতাকে তিনি মাতার মর্যাদা দিয়েছিলেন) জানতে পারেন পারেন যে তিনি দেরাদুনে সরকারি বনবিভাগে (Indian Forest Research Institute) করণিকের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। তার আগে অবশ্য কিছুকাল কসৌলিতে কাজ করেছিলেন।

শিক্ষিত মার্জিত আচার ব্যবহারের কারণে তিনি সবার কাছেই খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন সেখানে। মেধা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, ফ্রেঞ্চ ও বাংলাভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সরকারি বনবিভাগে কাজ করার সুবাদে একটি সুযোগ তাঁর কাছে এসে যায়। তখন দেরাদুনে যেসব বড়ো বড়ো সরকারি ইংরেজ অফিসার থাকতেন তাঁদের বাংলা শেখানোর গৃহশিক্ষক হয়ে গেলেন তিনি। তখন সরকারি ইংরেজ অফিসারদের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম চালু হয়েছিল যে তাঁরা যদি কোনো একটি দেশীয় ভাষা শিখতে পারেন তবে অতিরিক্ত অর্থ পাবেন; তাই অনেক বড়ো বড়ো ইংরেজ অফিসার এদেশীয় ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। গৃহ শিক্ষক হিসেবে বড়ো বড়ো ইংরেজ অফিসারদের ঘরের মানুষ হয়ে গেলেন রাসবিহারী। মনে মনে ইংরেজ শাসনকে ঘৃণা করলেও চতুর বুদ্ধিমান রাসবিহারী প্রকাশ্যে রাজানুগত্য দেখিয়ে চলতেন। কাজেই তাঁর গোপন বিপ্লবী কাজকর্মে কেউ কোনো সন্দেহই করত না। এমনকী ইংরেজ অফিসাররা তাঁকে এতটাই ভরসা করতেন যে এক ইংরেজ পুলিশকর্তা মিস্টার ডেনহাম তাঁকে গোয়েন্দার কাজেও নিযুক্ত করেছিলেন। এই কাজকে তিনি রক্ষাকবচ হিসেবে নিয়েছিলেন।

ছুটি পেলেই তিনি চন্দননগরে চলে আসতেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হলো। সারা বঙ্গজুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল। সেই আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশেই পড়েছিল। বিশেষ করে পঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে। রাসবিহারীর সাংগঠনিক ক্ষমতাও ভীষণ ভালো ছিল। কী করে গুপ্ত বিপ্লবী দল অন্য প্রদেশে গড়ে তলা যায় সে ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। পঞ্জাবের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। দেরাদুনে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে উত্তপপ্রদেশের সাহারানপুরের জিতেন্দ্রমোহন চ্যাটার্জির বন্ধুত্ব হয়। তিনি পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের (তখনকার ইউনাইটেড প্রভিন্স) বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন। এইভাবে রাসবিহারী পঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা সর্দার অজিত সিংহ (ভগৎ সিংহের কাকা), সুফি অম্বাপ্রসাদ প্রমুখ বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন। পরিচয় হয় দিল্লির বিপ্লবী নেতা স্কুলশিক্ষক আমীর চাঁদের সঙ্গে। এভাবে দেরাদুনে থাকার সময় রাসবিহারী গোপনে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পরিধি বঙ্গপ্রদেশের বাইরে অনেকদূর বিস্তার করেছিলেন।

এই সময় ১৯০৭-০৮ সালে পঞ্জাবে ইংরেজ সরকার ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে লালা লাজপত রাই এবং সর্দার অজিত সিংহকে গ্রেপ্তার করে বার্মার মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেয়। বিপ্লবী জিতেন্দ্র মোহন চ্যাটার্জি গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচার জন্য পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে তাঁর বিপ্লবী কাজকর্মের দায়িত্ব রাসবিহারীর হাতে দিয়ে আত্মগোপনের জন্য বিদেশে চলে যান। এভাবে রাসবিহারীকে কেন্দ্র করে বঙ্গের বাইরে একটি বিপ্লবী চক্র গড়ে উঠল। কিন্তু ইংরেজ প্রশাসক এসব ঘুণাক্ষরেও তার টের পেল না। কারণ তিনি দেরাদুনে এমন রাজভক্ত কর্মচারীর ভান করতেন যে তাঁর উপরওয়ালারা তাঁকে কোনোরকম সন্দেহই করতেন না। ১৯০৮ সালে ২৯ এপ্রিল মুজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডের উপরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপে সারাদেশ হতচকিত হয়ে পড়ে। ইংরেজ পুলিশ মানিকতলায় (মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি) বিপ্লবীদের গোপনে বোমা তৈরির আস্তানার খোঁজ পেয়ে যায়। একে একে ধরা পড়েন শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (নরেন গোঁসাই) প্রমুখ বিপ্লবী। ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকেই এই কাজের হোতা হিসেবে গ্রেপ্তার করে। শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে ১১ আগস্ট মুজফফরপুর জেলেই ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয় ইংরেজ সরকার। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার আগে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন।

সারাদেশে বিপ্লবীদের মধ্যে এই ঘটনার তীব্র প্রভাব পড়েছিল। এই সময় ইংরেজ সরকার অত্যন্ত ভীত হয়ে অশ্বিনী দত্ত, সুবোধ মল্লিক, পুলিন দাস, শচীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বঙ্গের অনেক বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে। পঞ্জাবের নেতারাও যেমন— হরদয়াল, সুফি অম্বাপ্রসাদ, সর্দার অজিত সিংহ গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় দেশ ছেড়ে চলে যান। রাসবিহারী এই সময় বঙ্গ থেকে পলাতক অনেক বিপ্লবীকেই পঞ্জাব বা অন্য জায়গায় আত্মগোপন করতে সহায়তা

করেছিলেন। বিখ্যাত নেতাদের অবর্তমানে বঙ্গ ও পঞ্জাবের বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দুই তরুণ নেতা— যথাক্রমে যতীন মুখার্জি (বাঘা যতীন) ও রাসবিহারী বসু। দুজনেই ছিলেন ইংরেজ সরকারের কর্মচারী। বঙ্গের বিপ্লবীদের ভয়ে ইংরেজ সরকার দিল্লিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এসময় রাসবিহারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বড়ো একটা কিছু করার কথা ভাবতে থাকেন; যাতে ইংরেজ সরকার দিল্লিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেও বিপ্লবীদের হাত থেকে নিস্তার না পায়। ১৯১১-তে তিনি দু-তিনবার চন্দননগরে আসেন। শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মতিলাল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোগাযোগ করেন বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মতিলাল রায়ের কাছে দুই বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস ও মন্মথনাথ বিশ্বাস বোমা বানানোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এরা দুজনই খুবই বিশ্বাসী এবং দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই দুই বিপ্লবীকে সঙ্গে করে নিয়ে যান রাসবিহারী। মন্মথনাথকে কাশীতে বিপ্লবী নেতা শচীন সান্যালের কাছে পাঠিয়ে দেন; আর ১৬-১৭ বছরের বসন্তকুমার বিশ্বাসকে সঙ্গে করে দেরাদুন নিয়ে যান। সেখানে বসন্তকুমারকে তাঁর রান্নার লোক পরিচয় দিয়ে নিজের কাছে রাখলেন এবং বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার ট্রেনিং দিতে লাগলেন। দেরাদুনে একটি বড়ো নির্জন বাগানবাড়িতে বোমা নিক্ষেপের মহড়াও দিয়েছিলেন তাঁরা। কয়েক মাস ট্রেনিং, এরপর বসন্তকুমারকে লাহোরে বিপ্লবী দলেরই একজনের ওষুধের দোকানে কম্পাউন্ডারের কাজে ঢুকিয়ে দেন। নিখুঁত ছকে এগুতে লাগলেন রাসবিহারী। তিনি ঠিক করেই ফেলেছিলেন ১৯১২ সালে রাজধানী স্থানান্তরের অনুষ্ঠানে বড়লাটের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবেন। রাজধানী পরিবর্তনের দিন এবং জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার কথা অনেক আগেই ঘোষণা করে সেইভাবে ইংরেজ সরকারের প্রস্তুতি চলছিল; আর এদিকে রাসবিহারীও তাঁর ঘনিষ্ঠ বিপ্লবীদের নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

অবশেষে এসে গেল সেই ঐতিহাসিক দিন। ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর। বেলা ১১-৪৫। রাসবিহারী ছদ্মবেশে, বসন্ত বিশ্বাসকে সুন্দরী তরুণীর বেশে সাজিয়ে উপস্থিত হলেন দিল্লির চাঁদনিচকে কাতরাধুলিয়ার একটি নির্দিষ্ট জায়গায়, যেখান দিয়ে ভাইসরয়ের শোভাযাত্রা যাবে। তারপর বড়োলাটের উপর নিক্ষিপ্ত হলো বোমা— যে ঘটনা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। কোলাহলের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন তাঁরা। বসন্ত ট্রেনে চলে গেলেন লাহোর আর রাসবিহারী চলে গেলেন দেরাদুন।

পাকা অভিনেতা রাসবিহারী রাজভক্ত কর্মচারীর ভড়ং করে দেরাদুনে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সিটিউটে একটি সভার আয়োজন করেন এবং ভাইসরয়ের উপর এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। শুধু তাই নয়, কয়েক মাস পরে ভাইসরয় সাহেব যখন দেরাদুনে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সিটিউট পরিদর্শনের আসেন তখন ওখানকার কর্মচারীদের নিয়ে একটি সংবর্ধনা কমিটি গঠন করেন রাসবিহারী এবং তাঁকে সংবর্ধনা দেন। এতবড়ো ঘটনার জন্য কেউ রাসবিহারীকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করল না। ইংরেজের পুলিশ, গোয়েন্দারা পাগলা কুকুরের মতো খুঁজেও তখনকার মতো ঘটনার কোনো হদিস করতে পারল না।

১৯১৩ সালের মে মাসে আর একটি ঘটনা ঘটালেন বিপ্লবীরা। লাহোরে বসন্ত বিশ্বাস পঞ্জাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গর্ডন সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপ করলেন। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন গর্ডন সাহেব। মারা গেলেন একজন পথচারী। বসন্ত বিশ্বাস পালিয়ে গেলেন। বোমার রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেল, এর মশলার উপাদান ভাইসরয়কে যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পুলিশ পাগলের মতো অপরাধীদের সন্ধান করতে লাগলো। পুলিশের জালে ধরা পড়লেন দিল্লির সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমীরচাঁদ। আমীরচাঁদের বাড়ি তল্লাশি করে পাওয়া যায় দীননাথ তলোয়ার বলে একজনের নাম। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এই দীননাথ তলোয়ার পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে বসে। ভাইসরয়কে বোমা মারার দুদিন আগে দিল্লিতে আমীর চাঁদের বাড়িতে বিপ্লবীরা মিটিং করেছিলেন। একে একে ধরা পড়েন অবোধবিহারী, বসন্ত বিশ্বাসকে লাহোরে ওষুধের দোকানে কম্পাউন্ডারের চাকরি দিয়ে রেখেছিলেন যিনি সেই বালমুকুন্দ। বসন্ত বিশ্বাস রাসবিহারীর নির্দেশে নদীয়াতে তাঁর গ্রামের বাড়ি চলে এসেছিলেন। তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। তিনি তার শেষকৃত্যে যোগদান করতে এসেছিলেন। তাঁর এক কাকা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে পুলিশে ধরিয়ে দিলেন। একে একে রহস্যের জট খুলতে থাকে। দীননাথ তলোয়ার রাজসাক্ষী হয়ে যায়।

দিল্লির দায়রা জজ হ্যারিসন সাহেব সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিচার করে দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিলেন। ওই রায়ে আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবোধ বিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম হয়। রায়ে জজসাহেব বলেন এই ঘটনার মূল হোতা হলেন রাসবিহারী বসু। ইংরেজ প্রশাসক যারা রাসবিহারীকে চিনতেন তাঁরা অনেকেই রাজভক্ত। রাসবিহারী যে এই কাজ করতে পারেন তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁরা অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন--- পুলিশের কোনো ভুল হচ্ছে না তো? কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণাদি দেখে জজসাহেব নিঃসন্দেহ। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হলো রাসবিহারীর বিরুদ্ধে। ঘোষিত হলো বড়ো অঙ্কের পুরস্কার। কিন্তু রাসবিহারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় রাসবিহারী?

রাসবিহারী তখন দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিকল্পনায় বিদেশের পথে পাড়ি দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র : ১. Revolutionaries—By Sanjeev Sanyal. ২. কর্মবীর রাসবিহারী— অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু। ৩. বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু— মনোরঞ্জন ঘোষ।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর মন্ত্রশিষ্য বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস

তরুণ বিশ্বাস

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগের এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাস। সেই সময় এই তরুণ বিপ্লবী কাঁপিয়ে তুলেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে দেরাদুন, লাহোর, দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারত। ১৮৯৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি নদীয়ার পোড়াগাছা গ্রামে এক বনেদি পরিবারে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক বসন্ত বিশ্বাসের জন্ম। ১৮৬০ সালে নীলচাষিদের বিদ্রোহে নেতৃত্বদান করে দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত ছিলেন তাঁর মেজদাদু পোড়াগাছার দিগম্বর বিশ্বাস ও চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। বসন্ত বিশ্বাস তাঁর জ্ঞাতিভাই মন্মথনাথ বিশ্বাস নিকটবর্তী মাধবপুর গ্রামে প্রখ্যাত জমিদার, ইঞ্জিনিয়ার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী গগনচন্দ্র বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত 'মাধবপুর শ্রীমন্ত সিভিল ইংলিশ স্কুলে'-এ ভর্তি হন। পরে ১৯০৬ সালে তাঁরা 'মুড়াগাছা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদ চন্দ্র গাঙ্গুলি ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যুগান্তর দলের সহকর্মী। তাঁদের অনুপ্রেরণায় বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯১০ সালে স্কুল ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য অমরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী পণ্যের দোকান 'শ্রমজীবী-সমবায় লিমিটেড'-এ কাজ শুরু করেন। দোকানটি ছিল বিপ্লবীদের একটি শক্ত গোপন ঘাঁটি। কিছুদিন পর অমরেন্দ্রনাথ দুই ভাইকে চন্দননগরে বিপ্লবী মতিলাল রায়ের কাছে পাঠান বোমা তৈরি, বোমা ছোড়াও বন্দুক চালানোর শিক্ষা নেওয়ার জন্য। মতিলাল রায়ের বাড়িতে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে বসন্ত ও মন্মথনাথের পরিচয় হয়।

রাসবিহারী বসু ১৯০৮ সালে কলকাতার মুরারীপুকুর বোমা মামলায় জড়িত থাকায় দেরাদুনে আত্মগোপন করেছিলেন। সেখানে বনবিভাগের এক গবেষণা কেন্দ্রের হেড ক্লার্কের কাজ নিয়ে 'টেগোর ভিলায়' থাকছিলেন। রাসবিহারী বৈপ্লবিক কাজের জন্য বসন্তের সপ্রতিভ আচরণ, বুদ্ধিমত্তা ও সুদৃঢ় মানসিকতা দেখে তাঁকে অমরেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে দেরাদুনে নিয়ে যান। এখানে বসন্ত 'বিশুদাস' ছদ্মনাম নিয়ে রাসবিহারী বসুর

রাসবিহারী বসু

কাজের লোক হিসেবে থাকেন। আগে বসন্ত অমরেন্দ্রনাথের কাছে বোমা তৈরি ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখলেও বাসবিহারী পুনরায় তাঁকে প্রায় তিনমাস তালিম দিয়েছিলেন বোমা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিক্ষেপ করার। এখানে বসন্তের ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ায় ১৯১২ সালের মাঝামাঝি বসন্তকে লাহোরে বিপ্লবী বলরাজের সহযোগিতায় সেখানকার 'পপুলার ফার্মেসি'তে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

রাসবিহারী বসু উত্তর ভারতের সমস্ত বিপ্লবী নেতৃত্বস্থানীয়দের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। সেখানে একটি গুপ্ত উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। এই গুপ্ত কমিটিতে মাস্টার আমীরচাঁদ, দীননাথ তলোয়ার, বালমুকুন্দ, বলরাজ ও বসন্ত বিশ্বাস স্থান পান। বসন্ত হয়ে ওঠেন রাসবিহারী বসুর ডান হাত। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশরাজ পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ আইন বাতিল বলে ঘোষণা করেন, সেই সঙ্গে ঘোষণা করেন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার কথা। সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগামী বছর শোভাযাত্রা করে বড়লাট হার্ডিঞ্জ নতুন রাজধানী উদ্বোধন করবেন। রাসবিহারী এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য ১৯১২ সালের ১৩ অক্টোবর লাহোরে গুপ্ত সমিতির একটি বৈঠক করেন। সেখানে হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় কুশলী বোমা বিশেষজ্ঞ কিশোর বসন্ত বিশ্বাসকে। ঘোষণা মতো ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে মুঘল বাদশার ব্যবহার করা হাওদায় চেপে স্থানীয় রাজন্যবর্গকে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে চাঁদনিচকের পথ ধরে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে দিয়ে জনসভার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসবিহারী বসুর নির্দেশে যথাস্থানে যথাসময় উপস্থিত হলেন বসন্তকুমার এক মহিলার ছদ্মবেশে। লীলাবতী নাম নিয়ে। প্রথমে ঠিক হলো চাঁদনিচকে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের বিপরীত দিকে প্রীতমদাসজীর বাড়ির দোতলার বারান্দায় মহিলাদের ভিড়ে মিশে সেখান থেকেই বসন্ত বড়লাটের শোভাযাত্রায় বোমা নিক্ষেপ করবেন।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে রাসবিহারীর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় সেই পরিকল্পনা পালটে যায়। হার্ডিঞ্জের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা চাঁদনিচকের কাছে আসার আগেই বসন্ত রাসবিহারীর নির্দেশে মহিলার পোশাক পালটিয়ে পুরুষের বেশে রাজপথের ধারে এসে দাঁড়ালেন। কারণ বসন্ত সমতল ভূমি থেকে বোমা ছোঁড়া অভ্যাস করেছে। শোভাযাত্রাটি কাছে এলে

রাসবিহারীর ইশারা পাওয়া মাত্র বসন্ত হাতির পিঠে বসে থাকা হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমাটি ছুঁড়ে দেন। বিকট বিস্ফোরণ আর চোখ ধাঁধানো ঝলকানির মধ্যে শুধু একটা আওয়াজ ভেসে উঠল— 'সাবাশ! মার ডালা।' বোমার আঘাতে বড়লাট আহত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হাওদার মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছত্রধারীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বিশৃঙ্খল জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে বসন্ত এবং রাসবিহারী বসু পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ব্রিটিশ সরকার শত চেষ্টা করেও অপরাধীকে ধরতে না পেরে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ সরকারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য দেরাদুনে বিশাল জনসভায় রাসবিহারী বসু সভাপতি হিসেবে দাঁড়িয়ে হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখেন। কিছুদিন পর রাসবিহারী বসুর কাছে খবর আসে সিলেট জেলার মৌলবি বাজারের মহকুমা শাসক অত্যাচারী গর্ডন সাহেব 'দয়ানন্দ আশ্রমে' গুলি চালিয়ে ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র দত্তকে হত্যা করেছে এবং আশ্রমটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানকার বিপ্লবীরা গর্ডনকে হত্যার চেষ্টা করে অসফল হন। সরকার আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে লাহোরে বদলি করে। এবার রাসবিহারী গর্ডনকে হত্যার দায়িত্ব দিলেন বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধবিহারীর ওপর। লাহোরে লরেন্স গার্ডেনে 'মন্টোগোমারি হল নামে একটি নৈশক্লাব ছিল, সেখানে গর্ডন নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ১৯১৩ সালে ১৭ মে সন্ধ্যাবেলায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বসন্ত এবং অবোধবিহারী 'লরেন্স গার্ডেনে' যান, কিন্তু গর্ডনের নিরাপত্তা এতটাই নিশ্ছিদ্র ছিল যে বসন্তকুমার তাঁর ধারে-কাছে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি বোমাটি গর্ডনের ফেরার পথের (জিমখানা লাইব্রেরি রোড) ওপর রেখে আসেন। গর্ডন সাহেব ফেরার আগেই রামপদ রথ নামে এক চাপরাশির সাইকেলের ধাক্কা লেগে বোমাটি ফেটে যায় এবং তার মৃত্যু ঘটে।

বসন্ত বিশ্বাস দিল্লি ও লাহোরে যে দুটি বোমা ব্যবহার করেছিলেন সে দুটি বোমা তৈরি করেছিলেন চন্দননগরের বিপ্লবী মণীন্দ্রনাথ নায়েক। বোমা দুটি দিল্লিতে নিয়ে যান

বসন্ত কুমার বিশ্বাস

চন্দননগরের জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ। ব্রিটিশ সরকার বোমা নিক্ষেপকারীকে ধরার জন্য স্কটল্যান্ড থেকে সেরা গোয়েন্দা নিয়ে আসে। দিল্লি ও লাহোরে নিক্ষিপ্ত বোমার টুকরো পরীক্ষা করে তারা এই সিদ্ধান্তে আসে যে হার্ডিঞ্জকে মারা বোমাটি এবং লাইব্রেরি রোডে বিস্ফোরিত বোমা একই মালমশলায় এবং একই পদ্ধতিতে বানানো হয়েছে। সম্ভবত বঙ্গেই এই বোমা তৈরি হয়েছে।

অবশেষে পুলিশ কলকাতার রাজাবাজার ট্রামওয়ে অফিসারস্ মেসে তল্লাশি চালিয়ে কিছু বিস্ফোরক ও সাংকেতিক ভাষায় লেখা একটি চিঠি পায়। চিঠির মর্মোদ্ধার করে উত্তর ভারতে বিপ্লবী দীননাথ তলোয়ারের নাম পায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে। দীননাথ আত্মরক্ষার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হয়ে বিপ্লবী সহকর্মীদের নাম বলে দেয়। তিনি স্বহস্তে লিখে জানিয়ে দিলেন যে রাসবিহারী বসুর নির্দেশে হার্ডিঞ্জকে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন নদীয়ার বসন্ত বিশ্বাস। আমীর চাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বলরাজকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বসন্ত ও রাসবিহারী আত্মগোপন করে থাকেন।

ইতিমধ্যে বসন্তের বাবার মৃত্যু হয়। ১৯১৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বসন্ত ঘাটশ্রাদ্ধের দিন কেনাকাটার জন্য কৃষ্ণনগরে তাঁর অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ছোটোকাকা প্রতাপচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে উঠেন। জনৈক আত্মীয় সরকারি চাকরিতে পদোন্নতির লোভে বসন্ত বিশ্বাসের খবর থানায় জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ বাড়িটি ঘিরে ফেলে। শেষ মুহূর্তে মন্মথনাথ বিশ্বাস বসন্তকে খবর দিতে এসেছিল পুলিশ আসছে তাঁকে ধরতে। কিন্তু হবিষ্যির মালসা হাতে ধরা নিরস্ত্র বসন্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও তাঁকে জড়িয়ে দিল্লি লাহোরের ঘটনা একত্রিত করে 'দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে ঐতিহাসিক মামলা শুরু করে ১৬ মার্চ ১৯১৪।

৫ অক্টোবর দিল্লি কোর্ট আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসির আদেশ এবং নাবালক বিবেচনায় বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। বসন্তকে ফাঁসি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার তাঁর জেলের ফাইলে বয়স ২/৩ বছর কারচুপি করে বাড়িয়ে ২৩ বছর বলে লাহোর হাইকোর্টে আপিল করে এবং বলা হয়েছিল সাবালক বসন্ত বিশ্বাস তাঁর ওইসব কাজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একতরফা বিচারে ১৯১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ হয়। এরপর বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হলে সেই আপিল ১৯১৫ সালে এপ্রিল মাসে অগ্রাহ্য হয়। ৮ মে ১৯১৫, দিল্লির সেন্ট্রাল জেলে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী এবং বালমুকুন্দের ফাঁসি হয়।

বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয় পঞ্জাবের আম্বালা জেলে ১০ মে (মতান্তরে ১১ মে), মাত্র ২০ বছর বয়সে। শত অনুরোধ সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার সৎকারের জন্য বসন্তের মরদেহ তাঁর প্রিয়জনদের হাতে দেয়নি। বসন্তের ফাঁসির দুদিন পরে ১৯১৫ সালের ১২ মে রাসবিহারী বসু পিএন (প্রিয়নাথ) ঠাকুরের ছদ্মবেশে চিরতরে ভারত ছেড়ে 'সানুকিমারু' জাহাজে জাপান রওনা হন দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। বসন্তের স্মৃতি রক্ষার্থে রাসবিহারী বসু নিজের হাতে জাপানের টোকিয়ো শহরে মাদাম-তেৎসু-কোং- হিগোচির বাগানে 'ওক' কাঠের স্মৃতিফলক প্রোথিত করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ভুলতে পারেননি তাঁর মন্ত্রশিষ্য প্রিয় বসন্ত বিশ্বাসকে। □

ফ : ৪

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বহুমুখী প্রতিভা

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটোবেলায় চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের মতিলাল রায়, শ্রীশ ঘোষ, চারুচন্দ্র রায় প্রমুখ বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসে কিশোর রাসবিহারী। বিপ্লবী নিরালম্ব স্বামী (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) হলেন বিপ্লব মন্ত্রে তাঁর দীক্ষাগুরু। যুদ্ধবিদ্যা শিখে ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি বরোদার সৈন্যদলে প্রবেশ করেন এবং মহান দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে সৈন্যদল ত্যাগ করে বঙ্গপ্রদেশে গিয়ে যুবকদের নিয়ে গোপন বিপ্লবী দল গড়ার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বঙ্গের যেখানে যত যুবকদের সংগঠন, ক্লাব ছিল, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাছা বাছা ছেলেদের নিয়ে গুপ্তদল গড়ার চেষ্টা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি চন্দননগরে এসেছিলেন এবং রাসবিহারীকে বিপ্লবীদলের উপযুক্ত মনে করে স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন এবং তার মনে স্বাদেশিকতার বীজ বপন করেন। সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে এককালে মহীরুহে পরিণত হয়। নিরালম্ব স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাসবিহারী চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজিয়েট স্কুলের পড়াশোনা ত্যাগ করে ফরাসি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। পরিকল্পনা পালটে তিনি এবার একটি অন্য রূপ ধারণ করেন। রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী বসু চন্দননগরে এসে শুনলেন তাঁর অমন মেধাবী ছেলে হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে ফোর্ট উইলিয়ামে কেরানির কাজ নিয়েছে। তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের চাকরি ছাড়িয়ে দেরাদুনের বনবিভাগের একটি চাকরি ছেলের জন্য জোগাড় করলেন। ১৯০৮ সালে বাইশ বছর বয়সে রাসবিহারী এই কাজে যোগ দিলেন।

১৯০৯ সালে পঞ্জাবে বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ, ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ, ১৯১৫ সালে সেনা বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, এই বছরই ছদ্মবেশে জলপথে তাঁর ভারত ত্যাগ; সিঙ্গাপুর, টোকিয়ো ও সাংহাই গমন, জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে ভারতে তাঁর অস্ত্র প্রেরণের প্রচেষ্টা, ১৯২৩ সালে জাপানের নাগরিকত্ব লাভ, ১৯২৪ সালে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' প্রতিষ্ঠা, জাপানে থাকাকালীন বিপ্লবী বীর সাভারকরের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ এবং হিন্দু মহাসভার জাপান শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন, ১৯৪১ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের পক্ষে রাসবিহারী বসুর ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ১৯৪২ সালের ১৫ জুন ঐতিহাসিক ব্যাংকক সম্মেলন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, ১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার অর্পণ, ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ-হিন্দ সরকার গঠন— বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর বহুমুখী ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে রাসবিহারী বহুরূপী নায়ক, অদ্বিতীয় অভিনেতা! ইংরেজ কেরানি ক্লাইভ যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার ভিত কাঁপিয়ে দেন তিনি। পূর্ব ভারতের যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বিপ্লবী বাঘা যতীন) আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাসবিহারী বসু ইংরেজ শাসককুলের শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। বাঘা যতীনের স্বরূপ ইংরেজ যত তাড়াতাড়ি জানতে পেরেছিল, রাসবিহারীর স্বরূপ তত তাড়াতাড়ি তারা জানতে পারেনি। তাই বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর দ্বারা বোমা বিস্ফোরণের পর ব্রিটিশ পুলিশ যখন মানিকতলার বোমার আড্ডায় হানা দিয়ে বিপ্লবীদের বন্দি করে ফেলে, তখন সেখানে রাসবিহারী লিখিত দুটি চিঠি হস্তগত হলেও তারা অনুমান করতে পারেনি যে, বিপ্লবী রাসবিহারী এবং কেরানি রাসবিহারী একই ব্যক্তি। কেরানি রাসবিহারী ইংরেজ শাসকের একান্ত অনুগত, রাজভক্ত প্রজা। দিল্লির বোমা বিস্ফোরণের পরও রাসবিহারীকে পুলিশ পাস দেয় দেরাদুনে বড়লাটের ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য, যে পাস পুলিশের ডিএসপি-ও পাননি। দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় ৫০০ টাকা পুরস্কার পাওয়া রাজসাক্ষী পূরণ সিংহ বলেছিল যে, রাসবিহারী তার সঙ্গে পুলিশের লোকের মতোই কথা বলতেন। অন্যতম সাক্ষী চরণদাস জেরার সময় জানিয়েছিল যে রাসবিহারী হচ্ছেন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা। কিন্তু ব্রিটিশ জজ হ্যারিসন বুঝতে পারেন যে রাসবিহারী সরকারের খয়ের খাঁ নন, ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোই করাই তাঁর উদ্দেশ্য। অসাধারণ 'মেক-আপ' ধারণে সিদ্ধহস্ত এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

সাহারানপুরে বিপ্লবী জেএম চ্যাটার্জির বাড়িতে সালোয়ার, কুর্তা, কুল্লা পরিহিত এক পাঠান, বা কাশীতে খাটা পায়খানা সাফাইকারী, ময়লার বালতি ও ঝাড়ু হাতে মেথর, চন্দননগরের এক পূজারি ব্রাহ্মণ, বিপ্লবী সহকর্মী রামশরণ দাসের স্ত্রীর নকল স্বামী সেজে লাহোরে থাকা পঞ্জাবি গৃহস্থ, কাশীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় হঠাৎ মৃত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি অথবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি পিএন ঠাকুর— ব্রিটিশ সরকারকে বার বার, অবলীলাক্রমে ধোঁকা দিয়েছেন পরাধীন দেশের এই মহাবিপ্লবী। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি জাপানে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। নিজের সম্পর্কে তিনি উক্তি করেছিলেন— 'আই অ্যাম এ ফাইটার। ওয়ান ফাইট মোর। দ্য লাস্ট অ্যান্ড দ্য বেস্ট।' স্বাধীনতা লাভের পর বিপ্লবী মহানায়কের নশ্বর দেহাবশেষ ভারতে এনে স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করে উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে আজও স্থাপন করতে পারেনি ভারতবাসী। ■

শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনী সারদা শিশু তীর্থের রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ২৫শে বৈশাখ শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনীস্থিত সারদা শিশু তীর্থ প্রাঙ্গণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথক নৃত্যশিল্পী ডঃ শুভ্রা মিত্র ও শিক্ষিকা শ্রীমতী চৈতালি বিশ্বাস। সকাল ৯টায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও মাতৃবন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। এরপর শিশুতীর্থের ভাই-বোনেরা মঞ্চস্থ করে সংগীত, নাটক, আবৃত্তি ও নৃত্য। শিশুতীর্থের ভাই-বোন, তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। শেষে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস। তারপরেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান

গত ৯ মে, ২৫শে বৈশাখ, সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে কলকাতার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশনস্ (ICCR)-এর সত্যজিৎ রায় সভাগৃহে 'কবিপ্রণাম, ওই মহামানব আসে' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যসাধিকা পদ্মশ্রী মমতা শঙ্কর, আইসিসিআর-এর জোনাল ডিরেক্টর রোহিণী নন্দন গোস্বামী, সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি ডঃ সরূপপ্রসাদ ঘোষ এবং কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য্য। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতির আবহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ চিন্তা আপামর মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন। সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীতের পর নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপরই উপস্থিত অতিথিবর্গ বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মেহেন্দি চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, গোপাল কুণ্ডু, রীণা ব্যানার্জি, গৌরী সেনগুপ্ত, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও মিলন খামারিয়া। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত ও সুমনা পাল ভট্টাচার্য।

রামপুরহাটে অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১০-১১ মে বীরভূম জেলার রামপুরহাটে ভারতমাতা ভবনে অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে পশ্চিমবঙ্গের সাংগঠনিক ২৮ জেলা থেকে ৭২ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ যুগল কিশোরজী, উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য কল্যাণ কুমার মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি অনিমেষ পাহাড়ি, সহ সভাপতি পঙ্কজ বন্ধু, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক অনিল রায় এবং কিষাণ সঙ্ঘের প্রচার প্রমুখ তথা 'ভারতীয় কিষাণ বার্তা'র সম্পাদক মিলন খামারিয়া। প্রশিক্ষণ শিবিরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বীরভূম জেলা সভাপতি শিবশঙ্কর মণ্ডল এবং জেলা সম্পাদক শিশির মণ্ডল। শিবিরের সঞ্চালনায় ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার।

মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বসের আত্মোৎসর্গ দিবস উদ্‌যাপন

গত ১১ মে মধ্য কলকাতাস্থিত মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হলো বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ১১১তম আত্মোৎসর্গ দিবস। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মেজ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর পৌত্র অভিজিৎ রায়। এছাড়াও বক্তব্যের মাধ্যমে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সহ-সভাপতি গোপাল চক্রবর্তী, সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পৌত্র পার্থসারথি বসু ও রজনীকান্ত বসু, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র পরিমল সেনগুপ্ত, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বাগচী বিশ্বাস, আন্দামান সেলুলার জেলে ১৪ বছর কাটানো বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর নাতনি কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সুদীপ বিশ্বাস, সুতপা বিশ্বাস, অর্পিতা বিশ্বাস, এমিলি বিশ্বাস ও কল্পনা বিশ্বাস, সংগীত শিল্পী ইন্দ্রাণী বসু, সাংবাদিক সুজাতা নাগ। তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকেই এদিন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন ইন্দ্রাণী বসু। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গোপাল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস।

অরণ্যষষ্ঠীই পরিবর্তিত হয়েছে জামাইষষ্ঠীতে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিনটিতে পালিত হয় আরণ্যক জীবনাভিজ্ঞতার এক অপরূপ কৃত্য 'অরণ্যষষ্ঠী'। দিনটি জামাইষষ্ঠী, বাঁটাষষ্ঠী বা স্কন্দষষ্ঠী নামেও অভিহিত। অরণ্যের সঙ্গে এই দিনটি সম্পৃক্ত, সম্ভবত অরণ্যকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে মানুষের হারানো যোগসূত্রের সাক্ষ্য-বহনকারী একটি পার্বণ। যখন অরণ্য-মাতাই ছিলেন মানুষের বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদদার। মানুষ যে যুগ থেকে খাদ্য-বস্ত্র- বাসস্থান ও ভেষজের জন্য নির্ভর করতো অরণ্যের উপর, সেই যুগের বন-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসব অরণ্যষষ্ঠী। কৃষি সভ্যতার যুগেও ছিল কৃষি-বন (Agroforestry)-এর ধারণা, বহাল ছিল অরণ্যের উপর প্রতিনিয়ত নির্ভরশীলতা। তাই যুগের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যষষ্ঠীর কৃত্য ক্রমে ক্রমে বদলে গেল। নানান যুগের পলিমাটি সরিয়ে যে মূল রূপটি খুঁজে নিতে হয়, তাহলো, সভ্যতার যতই অগ্রগতি হোক না কেন, অরণ্য ও তার বনস্পতি, তার অপরিমেয় জৈববৈচিত্র্য আজও আমাদের পরম আশীর্বাদ, কৃষিমাতার সঙ্গে বনদেবী আমাদের সতত রক্ষাকর্তা। ফুলে-ফলে-পল্লবে অরণ্য ভরে থাকুক আমাদের নানান প্রয়োজনে; এ তারই কৃতজ্ঞতার উপাসনা, অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অমোচ্য-সংযোগের চিরকালীন ইতিহাস।

ষষ্ঠী সর্বদা সন্তানের মঙ্গলময়ী মাতা। কেবল আপন সন্তান নয়, আপনার কন্যার স্বামীও যে তার সন্তান, এই বোধটি প্রকটিত হয়েছে জামাইষষ্ঠী নামের মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় নারী তার পুত্র-কন্যার সমগ্র পরিবারটিকে একসূত্রে গাঁথতে চান, তার প্রকাশ ঘটেছে জামাই আদরের প্রেক্ষাপটে। গ্রীষ্মের দিনে অধিকাংশ ভারতীয় ফল পেকে ওঠে গাছের শাখায় শাখায়। আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, কলা, বুনো খেজুর, ফলসা, আঁশফল, কুসুম, গাব, কেন্দু, কামরাঙ্গা পেকে ওঠেছে অজস্র। এই সুখের দিনে ছেলে-মেয়ের ভরা সংসার দেখতে চান হিন্দু নারী, নাতি-নাতনিদের হই-হুল্লোড়, গাছে গাছে দাপাদাপি। এরপর তো শুরু হবে বর্ষা, নদীনালা জলে পূর্ণ হয়ে যাতায়াত সুখের হবে না। তাছাড়া আমন মরশুমি চাষে ব্যস্ত হয়ে পড়বে সবাই। তাই ফলের মরশুমে তাদের সকলের নিমন্ত্রণ। দল বেঁধে কৃষি জমির উপান্তে জঙ্গল ঘেরা ফল বাগিচার মধ্যে কোনো এক প্রাচীন বৃক্ষের তলায় অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পুণ্যক্ষেত্রে পূজারিণীদের সমবেত পদচারণা।

এদিন ব্রতচারিণী হিন্দু রমণী তালপাতার এক পাখা বা ব্যজন, সঙ্গে দেবীপূজার নানান উপকরণ নিয়ে বনে প্রবেশ করেন। সেখানে বৃক্ষতলে অধিষ্ঠিত বিন্ধ্যবাসিনী অরণ্যষষ্ঠী দেবীকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধায় পূজা করেন, সমবেতভাবে দেবীর উপাখ্যান শোনেন, তারপর নানাবিধ মরশুমি ফলমূল পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করে নিজেরাও গ্রহণ করেন। সন্তানসন্ততির পরম কল্যাণ কামনাই এই ব্রতের মূলকথা। বৃহত্তর অর্থে

মনুষ্য সমাজ সবাই যে অরণ্যের সন্তান। কামনা এই— দেবী অরণ্য, তুমি যাবতীয় সম্পদ ভরিয়ে দিয়ে আমাদের ঐশ্বর্যশালী করে তোলো। অরণ্যের পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে আমরা পরিপুষ্ট হই এবং সুসন্তান লাভ করি, তোমাকে দোহন করেই আমরা সন্তানেরা দীর্ঘায়ু হই, ধনেজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক জনপদ। তাই অরণ্যষষ্ঠী অরণ্যের উপান্তে গড়ে ওঠা জানপদিক লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য সাধনা। অরণ্যেই ছড়িয়ে পড়ত গৃহীত ফলের বীজের প্রাচুর্য; তারপরেই আসতো বর্ষার ধারা, বীজের সুপ্তি কেটে চারাগাছ বেড়ে উঠতো আপন মনেই। অরণ্যের মাঝে ফলাহারের এ এক দারুণ উৎসব, অরণ্যকেই বর্ধিষ্ণু করে তুলতো। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের জঙ্গলবন্ধু যুগলপ্রসাদকে দেখি জঙ্গলের মধ্যেই তিনি বনস্পতির চারা লাগান, জঙ্গলেই বনসৃজন করেন। এ যে তেলা মাথায় তেল দেওয়া নয়! জঙ্গল কেটে ক্রমাগত বসতি স্থাপন করে, চাষাবাদ করে আমরা বনের রুখাশুখা মাটিকে নগ্ন করে দিয়েছি। বাদাবন কেটে ঝড়-ঝঞ্ঝার অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছি। অরণ্য যে কেবল কেটে নেবার জিনিস নয়, লুঠপাটের ক্ষেত্র নয়, তা ভারতীয় জীবনবোধ চিরকালই দেখিয়ে এসেছে। বিদেশি কলোনিয়াল ও অন্যান্য লুঠেরা শক্তিই ভারতবাসীকে অরণ্য লুঠপাট করতে শিখিয়েছে। অথচ প্রাচীন সাহিত্যে অরণ্যকে বলা হয়েছে 'দেবতার কাব্য'।

ষষ্ঠী দেবীর রূপকল্পনা কেমন? দেবী মানবীর মতোই দ্বিভুজা। বাম কোলে একটি শিশু। দেবীর বাহন একটি কালো বেড়াল। বাহন কল্পনার মধ্যে ফার্টিলিটি-কাল্ট বা প্রজনন-সংস্কৃতিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বেড়ালের বংশবিস্তার সম্পর্কে মানুষ সচেতন। এই দিন বেড়ালকে ভালোমন্দ খেতে দেবার মধ্যে জীবসেবার আদর্শকে ব্রতের আঙ্গিকে প্রোথিত করে দেওয়া হয়েছে। ব্রতের শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে একে অধুনা শাস্ত্রীয় ব্রত বলা হলেও তার মধ্যে লৌকিক ধারাটিও লুকিয়ে আছে। এটি নারীব্রত; বিবাহিত মেয়েরা এই ব্রত পালন করলেও কুমারী মেয়েরা মায়ের সঙ্গে গিয়ে বিবাহের আগে থেকেই পরিচিতি লাভ করে। অরণ্যষষ্ঠীকে শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় উভয় অনুষ্ঠানের যুগলমূর্তি বলা যেতে পারে। শাস্ত্রীয় এ কারণেই— এই ব্রতের আঙ্গিকে বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা— আচমন, স্বস্তিবাচন, 'সূর্যঃ সোমো' মন্ত্রপাঠ, কর্মারম্ভ সংকল্প, ঘটস্থাপন, আসনশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন, গণেশ ইত্যাদি দেবতার পূজা, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ষষ্ঠীর ধ্যান করে তাঁর পূজা। পূজান্তে ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা ইত্যাদি।

ভবিষ্যপুরাণে অরণ্যষ্ঠীর ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র পাওয়া যায়।

ষষ্ঠীধ্যান :

ওঁ দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠী বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্।।
দিব্যবস্ত্রপরীধানাং বামক্রোড়ে সুপুত্রিকাম্।
প্রসন্ন-বদনাং নিত্যং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাম্।।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দষষ্ঠীং সর্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম্।।

দেবীর প্রণামমন্ত্র :

জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠী দেখতে।।

অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথার মূল বিষয় হলো, মা এবং পরিবার যে মানুষের কাছে স্বর্গসুখের চাইতে অধিক কাম্য, তার প্রকাশ। জননীকে হতে হয় সংযমশীলা, নির্লোভা, ভক্তিপরায়ণা— তাও দেখানো হয়েছে ব্রতকথায়।

এক গৃহস্থ রমণী লোভের বশবর্তী হয়ে নিত্যদিন ভাঁড়ারের নানান খাদ্যবস্তু চুরি করে খেত, প্রশ্ন উঠলে বিড়ালের নামে অপবাদ দিত এবং এইভাবে ভোজনলালসা মেটানোর পরে আত্মরক্ষা করতো। এদিকে বিড়াল দেবী ষষ্ঠীর বাহন। তাই দেবীর কোপে পড়ে সেই রমণীর একাদিক্রমে ছয় পুত্র জন্মানোর অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এই ছয় পুত্র ছিল প্রকৃতপক্ষে শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধর। ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর ঘটনায় শ্বশুরবাড়িতে এবং সমাজে সেই রমণীর প্রবল বদনাম হলো। তারা তাকে সন্তানভোজী রাক্ষসী ঠাওর করলো। বুঝি নিজের সন্তান নিজেই খেয়ে ফেলে বধূটি! আত্মগ্লানিতে ওই রমণী গৃহ পরিত্যাগ করে বনে চলে গেল। বনে অজান্তে দেবীর থানে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলো সে। এদিকে গৃহে তার শাশুড়ি-মা ষষ্ঠীর আরাধনায় রত হলেন। বনে জন্ম নিল বধূর সপ্তম সন্তান। জন্মাতেই পূর্বের বিদ্যাধর ভ্রাতারা নবজাতককে এসে ডাক দিল, শিশুটিকে স্বর্গের যাবতীয় সুখের হাতছানি দিয়ে ডাকলো তারা। নবজাতক তার মা-কে জড়িয়ে ধরে বললে, মা কিংবা বোনকে ছেড়ে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়, যতই স্বর্গের ভোগ ও সুখ ডাক দিক না কেন! নবজাতক সেই ডাকে সাড়া দিল না। মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে ডাকলো সেই সন্তান। সন্তানকে কোলে জড়িয়ে মা কেঁদে ফেলল; দেবী ষষ্ঠীকে একমনে ডাকতেও লাগলো। করুণাময়ী দেবীর সেই থান, দেবী আবির্ভূতা হলেন অনতিবিলম্বে; বললেন, বিড়ালের নামে অপবাদ দেওয়ার অপরাধে তিনি তাঁর সকল সন্তানকে লুকিয়ে রেখেছেন, তার প্রতিটি সন্তানই দেবতুল্য। বধূ দেবীর চরণ প্রার্থনা করলে, তিনি এক মরা পচা বিড়ালের উপর দই ফেলে জিভ দিয়ে চেটে তা তুলে আনতে নির্দেশ দিলেন। বধূ সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে দেবীর কৃপায় বিড়াল-সহ হারানো ছয়পুত্র ফিরে পেল। সবাহন দেবীকে পূজা করে, সে সপুত্র গৃহে ফিরে এল। গৃহস্থ পরিবারে খুশির ঢল নামলো।

(লেখক বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক)

অবহেলায় পড়ে রয়েছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি

দিতি ভট্টাচার্য

ইতিহাসের চক্রপথ ধরেই সভ্যতা এবং বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন। সেই চক্রপথের গতিবিধি একটা রহস্যময় জলছবির মতো। বাস্তবতার সঙ্গে মিশে যায় রূপকথার গল্প। কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রণ থেকে প্রকৃত ইতিহাসের খোঁজে নিজেদের শশব্যস্ত রাখেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় বহু অজানা ইতিহাস উন্মোচিত হয় জনসমক্ষে। তাতেও যেন কিছুটা রয়ে যায় অন্ধকারের ঘেরাটোপে। আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল অনেক সময় নিরন্তর অবহেলায় হারিয়ে যায় কালের গর্ভে। ক্রমে ক্রমে তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রত্নক্ষেত্র পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রণিধানযোগ্য।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদের তীরে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম অঞ্চলের প্রথম তাম্র-প্রত্নযুগীয় প্রত্নস্থল। মধ্যপ্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থল বীরভনপুরের প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। ভৌগোলিক মানচিত্রে ঢিবিটির অবস্থান ২৩.২৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭.৩৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। ঢিবির বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য বরাবর দুশো মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ বরাবর একশো সত্তর মিটার। ঢিবিটির প্রধান অংশ রাস্তা থেকে পাঁচ মিটার উপরে।

১৯৫৪-৫৭ সালের মধ্যে এইস্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদ জবাসী লাল কর্তৃক খননকার্য পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে খনন চলে তার ফলে বঙ্গের প্রাক-ইতিহাসের তাম্র-প্রত্ন যুগীয় সাংস্কৃতিক পর্যায় জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

পাণ্ডু রাজার ঢিবি পশ্চিমবঙ্গের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি তাম্র-প্রস্তর নিদর্শনের স্থান। এখান থেকে এই যুগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন রকম রঙিন মাটির পাত্র উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব ভারতের তাম্রযুগীয় সভ্যতার সঙ্গে মধ্য ভারত ও রাজস্থান অঞ্চলের অনুরূপ সভ্যতার মিল পাওয়া গিয়েছে। সে যুগের লোকজন সুপরিকল্পিত শহর নির্মাণ করতে পারত। তারা শহরের পথে ফুটপাথ রাখত। তাদের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি ও বাণিজ্য। পাণ্ডু রাজার ঢিবিকে একটি বাণিজ্য নগরীর ধ্বংসাবশেষ মনে করা হয়। এখানকার মানুষের সঙ্গে যে শুধু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তাই নয়, এরা ক্রিট ও ম্যাসিডোনিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখত। এরা ছিল মূলত সমুদ্রচারী বণিক সম্প্রদায়। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে তাম্র-প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারা এবং লোহা ব্যবহারকারী মানুষ কীভাবে তাদের স্থান দখল করল সে সম্পর্কে জানা যায়।

খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শন :

ঢিবিতে একটি স্বর্ণমুদ্রার ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। এর এক পিঠে মাছের প্রতীক আঁকা। ঢিবিতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির নিদর্শন, চিত্রশোভিত মাটির পাত্র এবং মাতৃদেবীর প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। ঢিবিটির ওপরের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আগুনে পোড়া ইটের তৈরি স্থাপত্যকীর্তির যে সন্ধান পাওয়া গেছে তা দেখে অনুমান করা হয় এটি বৌদ্ধ অথবা হিন্দু উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ। পাথর ও হাড় নির্মিত হাতিয়ার পাওয়া গেছে। দুটি বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গেছে। তবে একটি মূর্তির দু'পাশের নিম্নাংশে দুটি মূর্তি দেখে মনে হয় এরা লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

এখানে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির ওপর নির্ভর করে গবেষকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, খ্রিস্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। অজয় নদের পাশে অবস্থিত এই জায়গা পশ্চিমবঙ্গের একটি গর্বের স্থান। কিন্তু সে ভাবে পরিচিত নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই এলাকায় খননকার্য চালিয়ে হদিশ পেয়েছিল চার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার। তারপর থেকে আউশগ্রাম-২ ব্লকের পাণ্ডুরাজার ঢিবি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা অধিগ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৮৫ সালে শেষবারের মতো খননের পর থেকে ক্রমেই অবহেলায় পড়ে রয়েছে এই এলাকা। ইতিহাস খ্যাত পাণ্ডুরাজার ঢিবির কিছু পুরনো ঐতিহাসিক মূর্তিরও উধাও হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, স্থানটির ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং পর্যটকদের কাছে এই জায়গাটির গুরুত্ব তুলে ধরা হোক। □

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশ্বদূত
পরমহংস যোগানন্দ

সুব্রত বাঁশ

একবিংশ শতকের শুরুতে যখন বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছিল, তখন এক ভারতীয় সাধক নীরবে রচনা করছিলেন এক ভিন্ন বিপ্লবের ইতিহাস— আধ্যাত্মিক বিপ্লব। তিনি হলেন পরমহংস যোগানন্দ (১৮৯৩-১৯৫২), যিনি পশ্চিমি বিশ্বে ভারতীয় যোগ, ধ্যান ও আত্ম-উন্নয়নের দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়।

১৯২০ সালে আমেরিকার বোস্টনে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব রিলিজিয়াস লিবারালস্-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে পরমহংস যোগানন্দ প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণে যান। এই যাত্রা ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সূচনা। একই বছর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেল্ফ- রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপ (এসআরএফ) — একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল যোগ, ধ্যান ও আত্মোপলব্ধির শিক্ষাকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া। তাঁর মতে, 'মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন, যা ধ্যান ও ক্রিয়া যোগের মাধ্যমে সম্ভব।' এই বার্তা শুধু ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সীমবদ্ধ থাকেনি, বরং তা ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত পশ্চিমি সমাজে। ১৯২৫ সালে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে এসআরএফের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর স্থাপন করেন। এখান থেকেই তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দর্শনের বিস্তার ঘটান। তিনি হাজার হাজার মার্কিন শিক্ষার্থীকে 'ক্রিয়া যোগ' চর্চার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির পথ দেখান। সেসময় সংবাদপত্রে তাঁকে 'দ্য ফার্স্ট যোগা মাস্টার অব ইন্ডিয়া টু মেক আমেরিকা হিজ পার্মানেন্ট হোম' নামে অবিহিত করা হয়। তাঁর বক্তৃতা ও লেখনীতে দেখা যায় হিন্দু দর্শনের সারাংশ, খ্রিস্টীয় আদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির এক সম্মিলিত প্রবাহ। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক সেতুবন্ধনের প্রয়াস করেন। পরমহংস যোগানন্দের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা নিঃসন্দেহে তাঁর আত্মজীবনী 'অটোবায়োগ্রাফি অব এ যোগী'। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত এই বইটি আজও বিশ্বজুড়ে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকারীদের অন্যতম অনুপ্রেরণা। গ্রন্থটি ৫০ টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে বেস্ট সেলার তালিকায় স্থান পেয়েছে।

অ্যাপল কর্পোরেশনের সহ প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জোবস এই বইটিকে তাঁর জীবনের অন্যতম দিকনির্দেশক বলে মনে করতেন। এমনকী তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত প্রতিটি অতিথিকে এই বইটি উপহার দেওয়া হয়েছিল। যোগানন্দ বিশ্বাস করতেন, সকল ধর্মই এক বৃহৎ সত্যের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি রচনা করেন 'দ্য সেকেন্ড কামিং ক্রাইস্ট', যেখানে তিনি যিশুখ্রিস্টের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেন যোগের আলোকে। এতে তিনি প্রমাণ করেন, খ্রিস্টান ও হিন্দু দর্শনের মধ্যে মৌলিক সংযোগ বিদ্যমান। এই ব্যাখ্যা ধর্মীয় সহনশীলতা ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। পশ্চিমি বিশ্বে একসময় যেভাবে সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে পরমহংস যোগানন্দ স্থাপন করেন এক আধ্যাত্মিক মিলনের দর্শন। তবে এটি ছিল অহিংস, আত্মিক ও মানবিক। যেখানে আধিপত্য নয় বরং আত্মিক মুক্তি ছিল মূল লক্ষ্য। যোগানন্দ বলেন, 'আমরা বিশ্বজয় করতে চাই না অস্ত্র দিয়ে, চাই না অর্থ দিয়ে; আমরা বিশ্বজয় করতে চাই ঈশ্বরের প্রেম ও আত্মজ্ঞানের আলো দিয়ে।' ১৯৫২ সালে তাঁর শারীরিক প্রস্থানের পরেও এসআরএফ এবং ভারতের যোগাদা সৎসঙ্গ সোসাইটি (ওয়াইএসএস) যোগানন্দের শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত রয়েছে। এসআরএফের সদর দপ্তর এখনো লস অ্যাঞ্জেলেসেই অবস্থিত এবং বিশ্বের ৬০ টিরও বেশি দেশে তাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র রয়েছে। যোগানন্দের 'হাউ টু লাইভ' সিরিজের ৭ টি গ্রন্থ আজও মানুষকে ব্যক্তিগত সমস্যা, দুশ্চিন্তা, একাকিত্ব এবং জীবনের লক্ষ্যহীনতা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। বর্তমানেও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যোগানন্দের দর্শন পড়ানো হয় ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিভাগের পাঠ্যক্রমে। তাঁর শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু পশ্চিমি যুবক ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং ভারত ভ্রমণ করেছে সাধনার উদ্দেশ্যে। বর্তমান বিশ্ব যেখানে প্রযুক্তিগত উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে, সেখানে মানুষ ক্রমশই মানসিক উদ্বেগ, একাকিত্ব ও আধ্যাত্মিক শূন্যতার শিকার। এই প্রেক্ষাপটে পরমহংস যোগানন্দের শিক্ষা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিশ্বজুড়ে মাইন্ডফুলনেস, মেডিটেশন ও যোগ আজ যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার পেছনে পরমহংস যোগানন্দের দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা ও নেতৃত্ব ছিল অন্যতম চালিকাশক্তি। আজ ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে আমরা যদি পরমহংস যোগানন্দের জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, দেখি এক আশ্চর্য মানসিক শক্তির ইতিহাস। তিনি কেবল একজন সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিশ্বদূত। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল যুক্তিনির্ভর, সার্বজনীন ও মানবকেন্দ্রিক। তিনি বিশ্বজুড়ে এমন এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যার শিকড় প্রোথিত ভারতে, কিন্তু ডালপালা বিস্তৃত সমগ্র মানবজাতির চেতনায়। □

ভারতে জেহাদি হামলা
আমাদের অনুভূতি ও দায়-দায়িত্ব

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভূত পুনরায় নড়াচড়া শুরু করেছে। জিওন কাঠির স্পর্শে তাকে দলীয় স্বার্থে জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের আর্মি জেনারেল আসিম মুনির একটা বক্তৃতা করেছেন এবং দর্শক গ্যালারি থেকে যথেষ্ট হাততালিও কুড়িয়েছেন। পাকিস্তানের জনমানসে তার বক্তৃতার মূল্য কতখানি, কতখানি তার গ্রহণযোগ্যতা সেটা দর্শকদের করতালি থেকেই বোঝা যায়। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ৭৫ বছর আগের পাকিস্তান সৃষ্টির রক্তাক্ত ইতিহাস এবং শ্রোতৃ-দর্শকমণ্ডলীকে আহ্বান করেছেন দেশের নব্য প্রজন্মকে পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস ও তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সম্যক রূপে অবহিত করতে। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে তদানীন্তন সময়ে অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে পাকিস্তান সৃষ্টি যে কতখানি বাস্তবতা ও জরুরি ছিল তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন— হিন্দু ও মুসলমান দুটো ভিন্ন জাতি; তাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সবই আলাদা। জাতির জনক মহম্মদ আলি জিন্না মরণপণ লড়াই করে অনেক রক্তের বিনিময়ে তাদের পাকিস্তান দিয়ে গেছেন। লড়াইয়ের মাধ্যমে আদায় করা এই ভূমিকে তাদের রক্ষা করতে হবে শুধু নয়, এই চেতনাকে বংশপরম্পরায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটা তাদের কর্তব্য।

পাকিস্তানের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মনস্ক নব্য প্রজন্ম আজকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি, মজহবি সমাজ ব্যবস্থা, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়ন, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অপমান এবং সর্বোপরি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কাঙ্গালপনা নিয়ে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মোজাফ্ফরাবাদে মানুষ রাস্তায় নেমে আসছেন, মুখে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান। তারা ভারতে যুক্ত হতে চায়, কারণ পাকিস্তানের অত্যাচার, শোষণ, মুদ্রাস্ফীতি এবং সর্বোপরি চীনের প্রভুত্ব, দাদাগিরি সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। সেটা তারা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। ওদিকে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো প্রদেশ আয়তনে পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের অর্ধেকেরও বেশি বালুচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন ধুমায়িত হচ্ছিল সেই আন্দোলন জোরদার হয়েছে এবং বালোচ স্বাধীনতাকামীরা পাকিস্তানি আর্মির বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান পড়েছে মহা আতান্তরে।

পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে কখনোই সফল গণতন্ত্র বলা যাবে না। প্রধানমন্ত্রীরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন কিন্তু বারবার সেখানে সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে এবং সেনা শাসকরা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখল করেছে। নির্বাচিত সরকার থাকলেও পাকিস্তান মূলত চলে সন্ত্রাসবাদী নেতা এবং সেনাবাহিনীর জেনারেলদের অঙ্গুলি হেলনে। সেখানকার সেনা মোড়লটি ভারতের বিরুদ্ধে সেখানকার ইসলামিক জনগণকে উত্তেজিত করতে চাইছে। আজকে পাকিস্তানের দুরবস্থা ঘরে-বাইরে এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ছাড়াও স্বয়ং সেনাবাহিনীর প্রধানকে ভারতের বিরুদ্ধে এইভাবে বিষোদ্গার করতে হচ্ছে। পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নড়ে চলা সেনা দেশের আপদ্কালে তাই সামনে চলে আসছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের কেয়ারটেকার সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা ড. ইউনুস সাহেব কৃতজ্ঞতার মাথা খেয়ে চীন ও পাকিস্তান সফর করছেন এবং বাংলাদেশের জেহাদিদের চাপে তিনি দেশের সংস্কৃতি সভ্যতা সমস্ত, কিছুকে পালটে ফেলায় প্রয়াসী হয়েছেন। একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে মিথ্যা দেশেদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত করে জেলে পুরেছেন এবং বিনা বিচারে তাঁকে আটকে রেখেছেন। সেখানে

ফঃ ৫

প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তিনি নির্বিকার! ভুলে গেছেন যে, তিনি একজন নোবেল লরিয়েট। ভারত-সহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তার কাছে সুবিচার চায়। সাম্প্রতিককালে তিনি চীন দেশে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। একটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশের (টেম্পোরারি হলেও) প্রধান। চীন গিয়ে ভারত বিরোধী স্টান্স নিতে গিয়ে চীনকে প্ররোচিত করেছেন এই বলে যে তারা ভারত মহাসাগরের কর্তা, তারা চীনকে সুযোগ করে দেবে, চীন ভারতের সেভেন সিস্টার্স পর্যন্ত ব্যবসা করতে পারবে। আসলে বলতে চেয়েছেন বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে তাদের ভারতের দক্ষিণ পূর্বের সাতটি রাজ্য দখল করে নিতে বাংলাদেশ সাহায্য করবে। তার ঘোষিত নীতি হচ্ছে, ভারতের সাতটি রাজ্যের সুস্থিতি ধ্বংস করা, ভারতের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করা।

পাকিস্তানের ঘোষিত নীতি হলো সন্ত্রাসবাদ পাচার করে ভারতকে রক্তাক্ত করা এবং ভারতীয় সমাজে যে শান্তি সুস্থিতি বিরাজমান তাকে ধ্বংস করে ফেলা, যাতে করে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের কাশ্মীরকে নিজেদের দখলে নেওয়া। এজন্য তারা স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই নিরন্তর লড়াই করে চলেছে। জেনারেল জিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ছায়া যুদ্ধের একটা স্কিম হাতে নিয়েছিলেন। ভারতে নিরন্তর জঙ্গি ঢুকিয়ে ভারতের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা, দেশের সম্পদ নষ্ট করার মধ্য দিয়ে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প ইত্যাদি ধ্বংস করে দেওয়া। এখনো পর্যন্ত একই লাইনে তারা কাজ করে চলেছে, যদিও সারা পৃথিবী আজকে তাদের ধিক্কার জানাচ্ছে। পাকিস্তান আজকে একটা ব্যর্থ দেশ এবং অবশ্যই দুনিয়ায় সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর ও রপ্তানিকারক! সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসেবে সারা পৃথিবীর কাছে পরিচিত, তথাপি তাদের শিক্ষা হয়নি। আর্থিক অবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। সেই দেশের অখণ্ডতা সার্বভৌমত্ব কতদিন বজায় থাকবে সে নিয়েও প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়েছে। কিন্তু কথায় আছে— স্বভাব যায় না মলে। সরাসরি যুদ্ধে বারবার পরাজিত হওয়ার পরেও পাকিস্তান নতুন নতুন ফন্দি, কৌশল গ্রহণ করে ভারতকে বিব্রত করতে চাইছে।

গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া নিরীহ নিষ্পাপ হিন্দু পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসী গুলিবর্ষণ অনেকগুলো প্রশ্ন চিহ্নের জন্ম দিয়েছে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সন্ত্রাসীরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে যেমন— মুম্বাইয়ের জঙ্গিহানা যা ৯/১১ নামে খ্যাত, দিল্লিতে লোকসভা ভবন আক্রমণ, বিভিন্ন মঠ মন্দিরে হামলা। কাশ্মীরে ২৬ জন হিন্দু পর্যটককে হত্যা করার ঘটনায় জেহাদিদের সন্ত্রাস ছড়ানোর কর্মকাণ্ডে একটা নতুন অভিমুখ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকার অনুমোদিত সন্ত্রাসবাদকে নতুন দিশা দেবার লক্ষ্যে একটি নতুন ধারা সংযোজন করল। ইতিপূর্বে দেখা গেছে, তারা সন্ত্রাসবাদী পাঠিয়ে ভারতে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করেছে এবং ভারতের সম্পদ ধ্বংস করেছে। বর্তমানে তাদের পরিবর্তিত ও জঘন্য অমানবিক পলিসি হচ্ছে, শুধুমাত্র হিন্দুদের আক্রমণ এবং হিন্দুদের হত্যা করা। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যখন বেছে বেছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সবরকম অত্যাচার করা হয়েছে, ভারতও পিছিয়ে নেই। এই তথাকথিত নেহরুভিয়ান সেকুলার দেশেরও হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে; তাদের জানমাল মান ইজ্জত ধন সম্পদ সমস্ত কিছু আজ বিপদের মুখে।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র হিন্দুদের হত্যা করা হয়, তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ঘরবাড়ি ভেঙে আগুন লাগানো হয়, সমস্ত ধন-সম্পদ গবাদী পশু লুণ্ঠন করা হয়! মেকি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকরা কিছু বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রগোষ্ঠী একে গোষ্ঠী সংঘর্ষ বা দাঙ্গা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিরস্ত্র নিরীহ প্রতিরোধ প্রতিবাদ ক্ষমতারহিত হিন্দুদের পলায়নকে এরা দাঙ্গা বা হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছে স্বার্থ গোষ্ঠীর নির্দেশে। বর্তমানের শক্তিশালী সমাজ ও গণমাধ্যমের সৌজন্যে আজকে মানুষ আর বুদ্ধিজীবীদের স্তোক বাক্য এবং রাজনৈতিকদের ধান্দাবাজি বিশ্বাস করেন না। তাই আজ প্রতিটি উঠোনে, পাড়ায়, আটচালার গ্রামীণ আড্ডায় মানুষের জেগে ওঠার লক্ষণ ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। জেহাদিদের সর্বগ্রাসী আক্রমণের মুখে আজ হিন্দুদের জেগে ওঠা ছাড়া কোনো পথ নেই।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক এবং ভণ্ড রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র ভারতীয় উপ মহাদেশে শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করার মাধ্যমে তাদেরকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা। নিকট অতীতে ২ শতাংশ হিন্দুর দেশ পাকিস্তানে মোল্লা মৌলবিরা একজন উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারকে হত্যা করেছে এবং ওদিকে বাংলাদেশে একজন হিন্দু নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা করেছে। প্রায় ৮০ শতাংশ হিন্দুর দেশ ভারতেও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। ভারতে এরূপ ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুরা চিরাচরিত সহনশীলতা ছিন্ন করে দিকে দিকে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী বামপন্থীদের এবং তাদের লেজুড় বুদ্ধিজীবীদের ন্যারেটিভের লড়াই— ভাতের লড়াই তাই মানুষ আজ আর গিলছে না। হাজার হাজার মাইল দূরে গাজাভূখণ্ডের কথা তাদেরকে আর নাড়া দেয় না। তার কারণ তারা আজকে বলতে শিখেছে যে, হামাস জঙ্গিদের নৃশংসতা কোনো অংশে কম নয়। শুধুমাত্র মুসলমান জঙ্গিগোষ্ঠীদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাস অ্যাপ্রুভ করবো আর ইজরাইল তার পালটা দিলে সেটাকে ধিক্কার জানাবো এই দ্বিচারিতা চলবে না।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বর্তমানের সবচেয়ে জঘন্য রাজনীতি হচ্ছে হিন্দুদের যে হত্যা করা এবং দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও এরকম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা জোরদার হচ্ছে। আমরা গর্ব করি যে, পশ্চিমবঙ্গ সহনশীলতা এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পীঠস্থান। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র হিন্দুরাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ। এ ব্যাপারে আমরা ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, চৈতন্য মহাপ্রভু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে উদ্ধৃতি দিই, তাদের জীবন দর্শন নিয়ে গর্ববোধ করি। কিন্তু আজ বাঙ্গালির অন্তঃসারশূন্য ভিত্তিহীন ধর্মনিরপেক্ষতা পরিষ্কার হয়ে গেছে সমস্ত ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর নিকটে। বাঙ্গালির ছদ্মনিরপেক্ষতা আজকে তাকেই উপহাস করছে। ইতিহাসগতভাবে সত্য যে মুসলমানরা কখনোই কোনোদিন অসাম্প্রদায়িক ছিল না এবং তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ মুসলিম লিগের মতো এক পার্টিশন পন্থী শক্তির জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকাতে এবং সেটার জন্মদাতা ছিল মুসলমান।

১৯৪৬ সালের নোয়াখালিতে শত শত হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের ঘটনা জানলে আমাদের শিহরিত হতে হবে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আজও ঘটে চলেছে নিঃশব্দ হিন্দু বিতাড়ন, নির্যাতন, হিন্দু নিধন। আমরা জেনেও না জানার ভান করি, শুনেও না শোনার ভান করি। পাছে ধর্মনিরপেক্ষতার শৌখিন ট্যাগ খুলে পড়ে! কিন্তু চোখ বন্ধ রাখলে প্রলয় থামে না বা তার মাত্রা

কমে না। ঝড় যখন ওঠে উটপাখি মুখ বালিতে গুঁজে দেয় কিন্তু তার জন্য ঝড় থামে না। এই উপরচালাকি দিয়ে, এই আত্মপ্রবঞ্চনা দিয়ে বাঙ্গালি হিন্দু বাঁচবে না, আজকে আমাদের সত্যের মুখোমুখি হতে হবে নির্দ্বিধায় নিঃসংকচে। সে সময় এসে গেছে। বাঙ্গালি হিন্দুর দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আজকে হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে শপথ নিতে হবে যে, ভারতের যে রাজনৈতিক দল ও রাজ্য সরকার হিন্দুদের সুরক্ষা নিরাপত্তা দেবে তাদের পক্ষেই তারা ভোট দেবে। একমাত্র তাহলেই এই মুসলমান জেহাদি শক্তিকে খানিকটা হলেও নিষ্ক্রিয় নিয়ন্ত্রণও করা সম্ভব।

কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন জোটবদ্ধতা। স্বামী প্রণবানন্দী মহারাজ আজ থেকে অনেকদিন আগেই বলে গেছেন— হিন্দুর সব আছে নাই শুধু ঐক্য। প্রকৃত যূথবদ্ধতাতেই রয়েছে শক্তি আর শক্তিশালীকে কেউ ঘাঁটায় না— এটা ইতিহাসগতভাবে সত্য। কিছুদিন আগে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া হৃদয়বিদারী সন্ত্রাসী হানার ছবি দেখতে দেখতে আমাদের হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। হানিমুনে যাওয়া নববধূ তার স্বামীর বুলেটবিদ্ধ রক্তাক্ত শরীরের সামনে অধোবদনে অশ্রুসজল নেত্রে বসে আছেন! আমরা নিশ্চিত এই ছবি পৃথিবীর কোথাও এমনকী ভারতেও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হবে না। এটা কোনো ইসলামিক বিশ্বে ঘটলে বা আক্রান্ত মানব মানবী যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের হতো তাহলে আজ সমাজমাধ্যম, গণমাধ্যম সমস্ত ক্ষেত্রে আহা, উহু করতে দেখতাম ও শুনতাম। আজ এত বছর পরেও সিরীয় শিশু আইলান কুরদীর মৃতদেহ সকলের চোখে ভাসছে। দেশে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি, অসহায় মানুষেরা ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইউরোপে পাড়ি জমাতে চায়। উদ্বাস্তুদের নৌকো সমুদ্রে ডুবে যায়। এতে শিশু আইল্যান কুর্দী-সহ সমস্ত মানুষের সলিল সমাধি ঘটে। এই ঘটনা নিশ্চিতভাবেই এক মর্মান্তিক ঘটনাই ছিল কিন্তু গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫ পহেলগাঁও কাণ্ডের ঘটনায় ঘটে যাওয়া এই টার্গেটেড কিলিং কোনো অংশেই কম মর্মান্তিক নয়। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে দুর্বলের সুখ-দুঃখ, তার উপর অন্যায় নির্যাতন মানুষ মনে রাখে না। তাই কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভারতের পথে পথে ঘুরলে, নিজ পাকা বাড়ি ছেড়ে তাঁবুতে বসবাস করতে বাধ্য হলেও তারা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আর জম্মু-কাশ্মীর সরকারকেও বলিহারি! একটা আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ ভ্রমণস্থলে এরূপ নিরাপত্তাহীনতা! ভাবা যায় না। সন্ত্রাসবাদী সীমান্ত পার করে এসে নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করে চলে গেল। তাদের গোপনাঙ্গ দেখে চিহ্নিত করা হলো। এই ভয়ংকর ভয়াবহতার জবাব কে দেবে? ভারতবাসীর অন্তরের গভীরে সৃষ্টি হওয়া ক্ষত কীভাবে পূরণ করা হবে!

বাংলাদেশ থেকেও জেহাদিরা ভারতে ঢুকে পড়ছে। প্রথমে তারা ঢুকে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলোতে; পরে সেখান থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি তাদেরকে জামাই আদরে সমস্ত কাগজপত্র বানিয়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অভিযোগ জানালে, তাদের বক্তব্য— বর্ডারে তারকাঁটার বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না জমির অভাবে। রাজ্য সরকার সীমান্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ অসহযোগিতা করছে। সাধারণ জনগণ বলবে— এতসব আইন আনা হচ্ছে দেশের স্বার্থে মানুষের কল্যাণে, দেশের সুরক্ষায় বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণের আইন আনা যায় না? ▯

শোক সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতীর প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ অংশু রায়ের মাতৃদেবী সন্ধ্যা রায় গত ৩ মে পরলোকগলন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

* * *

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাঁথি জেলার পূর্বতন জেলা সম্পাদক ননীগোপাল বেরা গত ১১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

* * *

শিলিগুড়ি মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক কললেশ সরকার গত ৯ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ কনা ও নাতি-নাতনিদের রেখে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিদ্যা ভারতী, সংস্কার ভারতী-সহ বহু সামাজিক সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

* * *

স্বস্তিকা পত্রিকার বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতী সুমিত্রা ঘোষ গত ২৭ এপ্রিল ভাগ্যনগরে (হায়দরাবাদ) তাঁর পুত্রের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি ১ পুত্র, পুত্রবধূ ও ১ নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারাসাত জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার নাথের মাতৃদেবী শ্রীমত্যা অন্নপূর্ণা নাথ গত ৬ মে গোবরডাঙ্গার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা এবং ৮ নাতি-নাতনিকে রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন নবদ্বীপ বিভাগ সঙ্ঘচালক দুর্গাদাস রায়চৌধুরী গত ৩ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। ষাটের দশকে তিনি নবদ্বীপ থেকে বহরমপুর শহরে এসেছিলেন সঙ্ঘকাজের জন্য। পরবর্তীতে সংসার জীবনে প্রবেশ এবং কাশিমবাজার মহাজন সমিতি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে তিনি জেলা সঙ্ঘচালক ও বিভাগ সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেন। মাঝে রাজনীতি ক্ষেত্রেও কিছুদিনের জন্য কাজ করেছেন। তিনি অনেক গান রচনা করেছেন এবং তাতে সুরারোপও করেছেন। বহরমপুরে সঙ্ঘ কার্যালয় নির্মাণে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

ছেচল্লিশের পদধ্বনি

পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি নিজভূমে পরবাসী

পল্লব মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপর হিংসার নতুন ঢেউ প্রাক-দেশভাগের অস্থির সময়ের সঙ্গে তুলনীয়, যা হিন্দু জনমানসে প্রবল ভীতি সৃষ্টি করেছে। রাজ্যে এই ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার পরিবেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'জঙ্গলরাজ'-এর অভিযোগ তুলেছে এবং ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা, সেই উদ্বেগজনক প্রশ্ন তৈরি করেছে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ একসময় ভারতীয় নবজাগরণের পীঠস্থান এবং বিপ্লবী চেতনার উৎস হিসেবে খ্যাত ছিল। আজ রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও গণতান্ত্রিক অবক্ষয়ের ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জিত। বর্তমান পরিস্থিতি কেবল আইনশৃঙ্খলার অবনতি নয়— এটি ১৯৪৬ সালের সেই বিভীষিকাময় ঘটনার এক উদ্বেগজনক প্রতিধ্বনি, যখন সোহরাওয়ার্দি 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' দিবসকে পরিকল্পিত হিন্দু নরসংহারে পর্যবসিত হতে দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে সেই ঘটনার উদ্বেগজনক সাদৃশ্য স্পষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরবতা, প্রকাশ্য তোষণনীতি এবং ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি অব্যাহত অবজ্ঞা বঙ্গ ইতিহাসের সেই অন্ধকার অধ্যায়ের উদ্বেগজনক স্মৃতিগুলিকে উসকে দেয়। ভ্রান্তির অবকাশ নেই, এটি দলীয় প্রতিযোগিতা বা আদর্শগত সংঘাতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক সংকট, এটি অভ্যন্তরীণভাবে ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক নীরব কিন্তু নির্লজ্জ যুদ্ধ। গণতান্ত্রিক পথে উত্থান হওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে ঘৃণিত এবং ক্ষমাহীন নির্লজ্জ প্রতিপক্ষ। কেন্দ্রীয় আইনের প্রতি তার বারবার অবজ্ঞা, বিচার বিভাগীয় ঘোষণার প্রকাশ্য উপহাস এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পদ্ধতিগত বিপর্যয় আঞ্চলিক স্বৈরাচারের জন্য একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলায় বাবা-ছেলের (হরগোবিন্দ দাস, বয়স ৭২ এবং চন্দন দাস, বয়স ৪০) হত্যাকাণ্ড যে কোনো সংবেদনশীল সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করত, কিন্তু তা রহস্যময় নীরবতায় চাপা পড়ে যায়। সহানুভূতি বা জবাবদিহিতার পরিবর্তে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের চিরাচরিত কৌশল— অস্বীকার, অন্যদিকে ঘোরানো এবং শয়তানীকরণের আশ্রয় নেয়। এমনকী তারা হাস্যকরভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে (বিএসএফ) এই সাম্প্রদায়িক হিংসার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে, যা পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার এবং শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করার চক্রান্ত। ভুলে গেলে চলবে না, মুর্শিদাবাদের মতো হিংসাকবলিত জেলায় শান্তি ফেরাতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিএসএফ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবুও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের উপস্থিতি ও ভূমিকা

নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের অপবাদ দেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর এই নিরন্তর আক্রমণ শুধু তুচ্ছ রাজনীতি নয়--- এটি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পদ্ধতিগত ক্ষয়। রাজ্য সরকারগুলো যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী, আদালত ও আইনের বৈধতা প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে তবে এর পরিণতি কী হবে? মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আইনি বিচ্ছিন্নতার একটি নতুন প্যাটার্ন পরিলক্ষিত করছে, যা অত্যন্ত ভয়াবহ।

হিংসা : পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য

পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক হিংসায় জর্জরিত। মাওবাদের (নকশাল) অস্থির দিনগুলি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেস শাসনের শুরু, সিপিআই (এম)-এর শাসনে তীব্রতর হয়ে, বর্তমানে তৃণমূল শাসনে নতুন নির্লজ্জতায় এই ধারা অব্যাহত। খেলোয়াড় বদলালেও খেলার নিয়ম একইরকম রয়েছে। শুধু সরঞ্জাম ও সুবিধাভোগী ভিন্ন। আগে কংগ্রেস, তারপর সিপিএম, এখন তৃণমূল— কিন্তু তৃণমূল স্তরের হিংস্র সৈনিকরা প্রায় একই রয়ে গেছে। ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের আনুগত্যও বদলায়। সুখের কথা যে, প্রধান বিরোধী শক্তি হওয়া সত্ত্বেও বিজেপি অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থেকেছে। সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রায়শই দুর্বলতা হিসেবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শক্তি সংযমের মধ্যে নিহিত। ক্রমাগত উসকানির মুখে বিজেপি আদালত, কমিশন ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাজ করার চেষ্টা করেচলেছে। তবে, জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে এবং পশ্চিমবঙ্গের ভোটররা— বিশেষত নিপীড়িত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ— শুধু প্রতিনিধিত্ব নয়, দৃঢ় সুরক্ষা প্রত্যাশা করেছে। এই পরিস্থিতিতে নিপীড়িত হিন্দু সমাজ বিজেপিকে তাদের উপর সহানুভূতিশীল ও রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখে। হিন্দু সমাজ চায় গোপাল মুখার্জির মতো নেতৃত্ব যিনি ১৯৪৬ সালের হিন্দুহত্যায় মুসলিম লিগের উন্মত্ত জেহাদিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত করেছিলেন এই প্রত্যাশা হিংসার নয়; বীরত্বের, শৌর্যের, সাংবিধানিকভাবে পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক প্রতিশক্তি যা নৈতিক স্পষ্টতা এবং আইনি দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবে।

কাটমানি, দুর্নীতি ও অপশাসন

রাজনৈতিক হিংসা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ব্যাধি হলেও, দুর্নীতি এর সবচেয়ে ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধি। সাম্প্রতিক ভুয়ো নিয়োগ প্রক্রিয়ার কারণে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষক ও শিক্ষককর্মীর নিয়োগ বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট, যা তৃণমূল সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বড়ো প্রমাণ। শীর্ষ আদালতের অবৈধ নিয়োগ, বেতন পুনরুদ্ধারের নির্দেশনার পরে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল পদত্যাগ ও জবাবদিহিতা। পরিবর্তে যা দেখা গেল তা হলো ঔদ্ধত্য, অহংকার ও চিরাচরিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রত্যাখ্যান। 'কাটমানি' শব্দটি এখন বাঙ্গলির দৈনন্দিন শব্দভাণ্ডারে ঢুকে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে হপ্তাবাজি সংস্কৃতিকে। বাড়ি তৈরি করা, দোকান খোলা বা চাকরি খোঁজা— পার্টির ক্যাডারকে ঘুষ না দিলে কিছুই হয় না। এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক তোলাবাজি বা শোষণ চক্র যা দরিদ্রতমদের শিকার করে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পশ্চিমবঙ্গের একসময় সমাদৃত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, তথাকথিত ভদ্রলোক, হয় এই দুর্নীতির সহযোগিতাকারী, নয়তো উদাসীন দর্শক হয়ে রয়েছেন। যারা একসময় এই বঙ্গসমাজ রামমোহন রায়, ঠাকুর ও অরবিন্দের মতো নক্ষত্র তৈরি করেছিল, রাজনৈতিক সুবিধার কাছে সেই সমাজের এলিট শ্রেণী এখন আত্মসমর্পণ করেছেন। কংগ্রেস থেকে কমিউনিস্ট এবং এখন তৃণমূলে সেই ভদ্রলোকেরা তাদের আনুগত্য পরিবর্তন করেছেন। বিজেপিকে তাঁরা এখনও বহিরাগত শক্তি হিসেবে দেখে, উপহাস ও বিদ্বেষ করে। কয়েক দশকের মার্কসবাদী মতাদর্শ এবং তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা এই শ্রেণীকে নৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান শাসন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য অবজ্ঞা, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে তাঁর সরকারের প্রতিরোধ এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করে চিত্রিত করা--- এসবই বিভাজনের গভীর পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়। তাঁর মন্ত্রীরা বারবার জাতীয় নায়ক, হিন্দু প্রতীক এবং সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বারবার উসকানিমূলক মন্তব্য করেন। যা দেখা যাচ্ছে তা প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বৈচারিক বিদ্রোহ যা রাজ্যকে ক্রমাগত ইসলামি আগ্রাসনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সন্দেশখালি, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ, বসিরহাট এবং অন্যান্য অসংখ্য স্থান এখন আইনহীনতা, সাম্প্রদায়িক তোষণ এবং হিন্দুদের প্রতি উদাসীনতার জীবন্ত প্রমাণ। বিজেপি শাসিত কোনো রাজ্যে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তথাকথিত মিডিয়া ও নাগরিক সমাজ ঝড় তুলে দিত। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়মুক্ত হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃণমূল স্তরের কর্মী থেকে ড্রয়িংরুমের বুদ্ধিজীবী এবং নিউজ রুমের সম্পাদক সকলেই নীরব ব্যক্তিস্বার্থের কারণে। বিজেপি এখন শুধুমাত্র একটি বিকল্প নয়— পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতাগত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক রক্ষাকবচ। টিএমসি-র থেকে সামান্য ভোটে পিছিয়ে থাকা বিজেপির গণতান্ত্রিক পুনরুত্থানের নেতৃত্বের দায়িত্ব ও অধিকার তাদেরই। তবে শুধু নির্বাচনী অঙ্ক দিয়ে এটা সম্ভব নয়।

এখন গভীর সাংস্কৃতিক সংযোগ, জনআন্দোলন ও বিমর্শের সংশোধন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের নবজাগরণ চাই— সনাতন মূল্যবোধ, জাতীয়তা, নির্ভীক সত্যের পথে। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, চাই সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। মা দুর্গার পবিত্র ভূমি থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের তেজোদীপ্ত স্লোগান— বঙ্গভূমি চিরকাল পথ দেখিয়েছে। সেই নেতৃত্ব আবার চাই— ভয়, বিভেদ আর মিথ্যার কবল থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে। সোনার বঙ্গভূমির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতীয়তাবাদী, বিদ্বান, কর্মী ও যুবকদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে, যারা রাজ্যকে পুনরায় দেশের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। □

অন্যের ক্ষতির চিন্তা ঠিক নয়

এক বনে একটি কুকুর ও একটি মোরগ ছিল। তাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব। সব সময় তারা একসঙ্গে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছিল যে, রাত্রিবেলা একজন যখন ঘুমাবে তখন আর একজন জেগে পাহারা দেবে। বনের মধ্যে একটি গাছের উপরে মোরগটি থাকত আর কুকুর থাকত গাছের নীচে। পালা করে তারা জেগে থাকত। রাত্রি কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠলেই মোরগ স্বভাব অনুযায়ী উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠত।

একদিন এক শেয়াল দূর থেকে মোরগের ডাক শুনতে পেল। তারপর খুঁজতে খুঁজতে ওই গাছের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গাছের ডালে মোরগকে বসে থাকতে দেখল। ওই সময় কুকুরটি সেখানে ছিল না। কোনো কাজে একটু দূরে চলে গিয়েছিল।

মোরগকে দেখে শেয়াল মনে মনে ভাবল, বাঃ, বেশ তো। আজ এটাকে মজা করে খেতে হবে। তার জিভে জল এসে গেল। শেয়াল খুবই চালাক প্রাণী। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে। সে মনে মনে ফন্দি আঁটল, কীকরে ওটাকে গাছ থেকে নামানো যায়। কাঁটাগাছে ওঠা এই তার পক্ষে সম্ভব নয়। দেরি করলে মোরগটি উড়ে চলে যাবে।

শেয়াল বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে একেবারে গাছের কাছে চলে এল। আর চিৎকার করে কথা বলে মোরগের সঙ্গে ভাব জমাতে শুরু করল। সে মোরগকে ডেকে বলল, ভাই, তুমি খুব উপকারী ও ভালো পাখি। ভোরবেলা কী সুন্দর করে ডেকে ওঠো আর সবাইকে জাগিয়ে দাও। তবেই তো সবাই ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে কাজকর্ম সারতে পারে, তা না হলে কী যে হতো! এসো না ভাই ওই গাছের উপর থেকে নেমে, তোমার সঙ্গে বসে দুদণ্ড মনের কথা বলি। আহা! তোমার মতো এত ভালো পাখিকে বন্ধু হিসেবে পাবো তা কল্পনাও করতে পারিনি। আহা! কী সৌভাগ্য আমার। এসো এসো, নীচে নেমে এসো, দুজনে বসে বন্ধুত্ব করে নিই।

এদিকে মোরগ তো বেশ বুঝতে পেরেছে, শেয়ালের এত উৎসাহের কারণ কী! ও ব্যাটা নিশ্চয় তাকে খেতে চায়, তাই এত ভালো ভালো কথা বলছে। এসব তোষামোদের আসল উদ্দেশ্য যে কী তা বুঝতে বাকি রইল না মোরগটির।

সে তখন শেয়ালকে ডেকে বলল, ভাই শেয়াল, তুমি যে আমার মতো সামান্য এক পাখিকে বন্ধু বলে পেতে চাইছ, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ প্রাণীকে বন্ধু হিসেবে কি সবাই পেতে পারে? তুমি এক কাজ করো, এই গাছের নীচে এসে বসো, আমি এক্ষুনি নেমে আসছি।

এদিকে কুকুর তার কাজ সেরে ফিরে এসে গাছের আড়ালে চুপটি করে লুকিয়ে রয়েছে। মোরগের কথা শুনে শেয়াল তো আনন্দে আটখানা। মোরগটা নীচে নামলেই সে ধরে খেয়ে নেবে। তার উপর মোরগটা তাকে বুদ্ধিমান বলেছে। কেউ বুদ্ধিমান বললে শেয়ালের বড়ো আনন্দ হয়। সে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে গাছের নীচে চলে এল। কে কোথায় আছে, কোনো কিছুই দেখার কথা তার মাথাতেই এল না।

এদিকে গাছের তলায় লুকিয়ে ছিল মোরগের বন্ধু কুকুরটি। সে তো সব লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছে। মনে মনে বলল, দাঁড়াও, তোমার মজা আমি বের করছি। শেয়াল তো আনন্দে ডগমগ হয়ে আনমনা ছিল। কুকুর সেই ফাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ল শেয়ালের উপর। তরপরে আঁচড়ে কামড়ে তাকে একেবারে শেষ করে দিল।

ছোটো বন্ধুরা, অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে নিজেরই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে, একথা সবার মনে রাখা উচিত।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

সাইলেন্ট ভ্যালি

সাইলেন্ট ভ্যালি জাতীয় উদ্যান কেরালা রাজ্যের মালাপ্পুরম জেলা এবং তামিলনাডু রাজ্যের নীলগিরি জেলার সীমান্তের নীলগিরি পাহাড়ে অবস্থিত। এর মূল আয়তন ৮৯. ৫২ বর্গকিলোমিটার। এটি ১৪৮ বর্গকিলোমিটার (৫৭ বর্গমাইল) আয়তনের একটি বাফার জোন দ্বারা বেষ্টিত। ইংরেজরা এই অঞ্চলের নামকরণ করেছিল। কারণ এখানে বন্য জীবজন্তুর

কোলাহল ছিল না। বর্ষাকালে এখীানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই উদ্যানে ৩৪ প্রজাতির স্তন্যপায়ী রয়েছে যার মধ্যে বিপন্ন সিংহলেজওয়ালা ম্যাকক, নীলগিরি ল্যাঙ্গুর, মালাবার জায়ান্ট কাঠবেড়ালি, নীলগিরি তাহের পেসোয়ার বাদুড় ও লোমশ বাদুর। ৯ প্রজাতির বাদুড় দেখা যায়। রয়েছে১২৮ প্রজাতির প্রজাপতি এবং ৪০০ প্রজাতির মথ। রয়েছে ১০০০ প্রজাতির ফুলের গাছ, ১০৮ প্রজাতির অর্কিড, ১০০ প্রজাতির ফার্ন এবং ১১০ রকমের ভেষজ উদ্ভিদ।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৬৯

কদা ? – কখন ? বাসরঃ – বার।

বাসরাণাং নামানি – বারগুলির নাম।

সোমবাসরঃ – সোমবার।

মঙ্গলবাসরঃ –মঙ্গলবার।

বুধবাসরঃ –বুধবার।

গুরুবাসরঃ – বৃহস্পতিবার।

শুক্রবাসরঃ –শুক্রবার।

শনিবাসরঃ – শনিবার।

রবিবাসরঃ –রবিবার।

ভালো কথা

আমার অনুভব

স্বস্তিকা পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে আসে। বাবা খুব মন দিয়ে পড়েন। আমারও পত্রিকাটি খুব ভালো লাগে। আমি নবাঙ্কুর বিভাগটি খুব মন দিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে আমার দিদির লেখা বের হয়। আমি দিদির লেখা ও অন্য লেখাগুলি মন দিয়ে পড়ি আর 'লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দ গঠন' এবং 'সঠিকভাবে সাজাও' সমাধান করে পাঠাই। আমারও নাম কখনো কখনো ছাপা হয়। আনন্দের কথা, এবছর আমার দিদিকে নবাঙ্কুর বিভাগে বেশি অংশগ্রহণের জন্য স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে পুরস্কিত করা হয়েছে। আমার খুব আনন্দ হয়েছে যে, অনেক বড়ো মাপের লেখকের সঙ্গে দিদিকে সম্মানিত করা হয়েছে। আমি, বাবা ও মা দিদির সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। আমিও খুব উৎসাহিত হয়েছি। আমারও তিনটে লেখা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আমি চেষ্টা করবো আরও ভালো লেখা দেবার।

সপ্তর্ষি রায়, ষষ্ঠশ্রেণী, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ছোট্টো কবি

অভীক সরকার, নবম শ্রেণী, দৌলতপুর, দঃ দিনাজপুর

কবিতা লিখতে চেষ্টা করি
লিখতে পারি না,
মনে মনে অনেক ভাবি
তবু পারি না।
অনেক ভেবে লিখতে বসলাম
মনটাকে ঠিক করে
এবার দেখি কেমন যেন
পাতা যাচ্ছে ভরে।

বাবা বললেন, পাঠিয়ে দাও না
নবাঙ্কুরের পাতায়
এমনি করে লিখতে থাকো
যা আসে সব মাথায়।
লিখেতে থাকি খাতা ভরে
যা আসে মনে সবই
মা বললেন, এখন তুমি
ছোট্টো একজন কবি।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

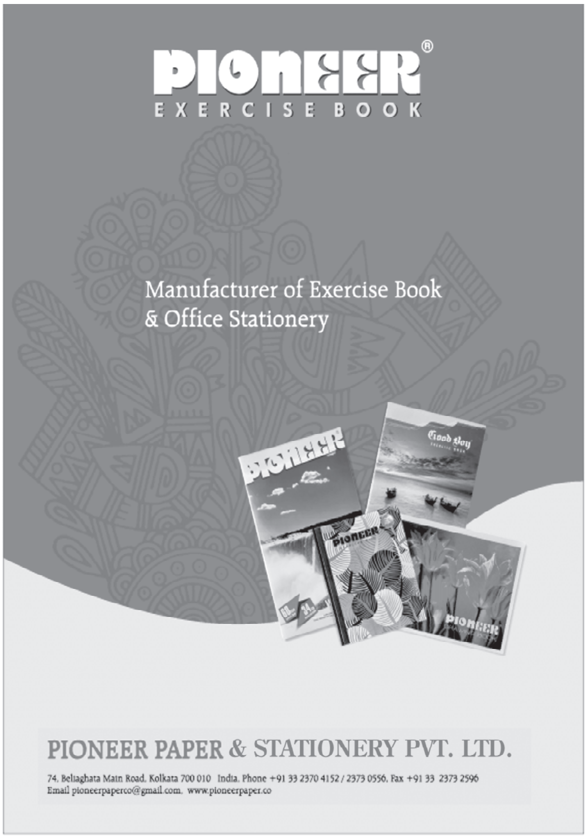

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

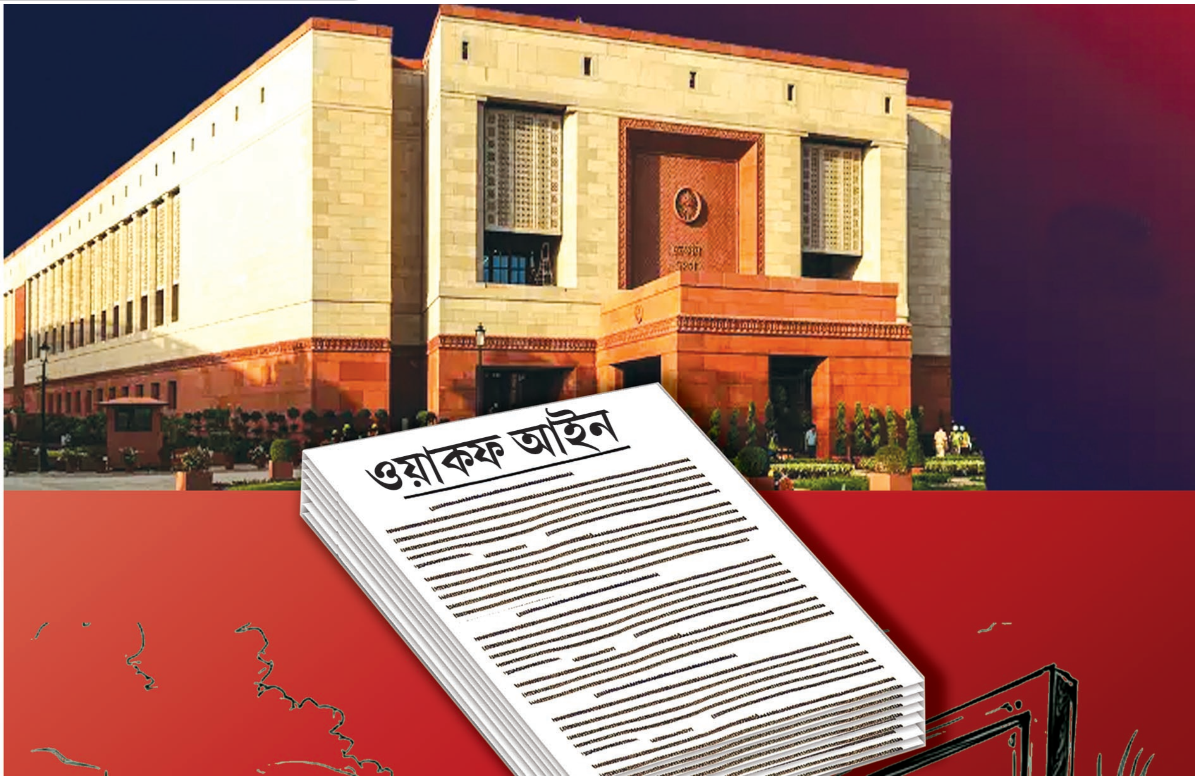

ওয়াকফ নিয়ে এত অশান্তির নেপথ্যে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের রাজনীতি

(প্রথম পর্ব)

কাজি মাসুম আখতার

'এই বাংলায় নয়, ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করার ইচ্ছে হলে দিল্লি যান! ওয়াকফ সংশোধনী আইন দিল্লির কেন্দ্র সরকার করেছে। এখানে গুলোগুলি করবেন না। যদি করেন আমার চেয়ে আপনাদের বড়ো শত্রু আর কেউ হবে না'— বক্তা স্বয়ং মমতা ব্যানার্জি। ক'দিন আগে মুর্শিদাবাদের সুতিতে প্রকাশ্য জনসভায় ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তাঁর এই ব্যতিক্রমী হুঁশিয়ারি ভাষণ শুনলাম। জানি না, দিঘায় সদ্য জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করেই এতদিন পর ওয়াকফ আন্দোলনের বলি সামশেরগঞ্জের হিন্দু অত্যাচারিতদের পাশে থেকে 'হিন্দু ভোটারদের বার্তা দিতেই মুখ্যমন্ত্রী একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কিনা। এত পরিশ্রম করেও ২০২৬-এর বিধানসভায় হিন্দু ভোট শুভেন্দুদের থেকে ছিনিয়ে যদি নাই নেওয়া গেল— তাহলে এত খরচ করে মন্দির বানিয়ে কী লাভ হলো?

আর মুসলমান ভোট তো সবসময় পকেটেই থাকে। এইটুকু হুমকিতেই পকেট ছিঁড়ে যায় না কি? ঠিক সময়মতো মলম দিয়ে দেব। হিন্দুরা একটু ট্যা-ফুঁ করলে প্রয়োজনে আবার দাঙ্গার ভয় দেখিয়ে দেব। অথবা মুসলমানদের দাঙ্গা করার সুযোগ করে দেব। যেমনটি সম্প্রতি সামশেরগঞ্জে করিয়ে দিলাম। সাধে কী ওদের 'দুধেল গাই' বলেছি। ওরা কিন্তু শব্দবন্ধটি খুব আপন করে নিয়েছে। 'আত্মসম্মান' শব্দটি ওদের অভিধানে আছে না কি? থাকলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ হতো। তাই 'আমার চেয়ে বড়ো শত্রু কেউ হবে না' বললেও আমার ভোট মার যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় এই সবই ভেবেছেন। তাই দুধেল গাইদের সিএএ, এনআরসি ইস্যুতে আন্দোলন করতে দিল্লি যেতে বলেনি। আবার তিনি নিজে একশো দিনের কাজ বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যুতে দিল্লি না গিয়ে কলকাতায় আন্দোলন করে মোদীকে বার্তা দিতে খুব ভালোবাসেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত ওয়াকফ আন্দোলনকারীদের দিল্লি খেদিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন— ১. ওয়াকফ সংশোধনী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কেন্দ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে চূড়ান্ত অসম্মান করেছে এই বিষয়টি তুলে ধরে মুসলমানদের দিল্লিতে যাওয়ার বার্তা দিয়ে নিজের মুসলমান তোষণকারীর তকমায় কিছুটা প্রলেপ লাগানো, ২. মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ক্ষেপে উঠে তারা যদি সত্যিই দিল্লিতে গিয়ে অভ্যাসগত কারণে আন্দোলনের নামে হল্লা শুরু করে এবং মোদীর

ফঃ ৬

পুলিশের হাতে প্রবল পেটানি খেয়ে পশ্চিমবঙ্গের ফিরে আসে— তাহলে তাদের নিয়ে মোদী হটানোর রাজনীতি খুব ভালোভাবে করা যাবে।

ধরে ফেলেছি বুঝে দিদি নিশ্চয়ই মুচকি হাসছেন। কিন্তু তিনি জানেন, আমাদের মতো কুৎসা পক্ষের মানুষজন খুঁচিয়ে যতই ঘা করুক না কেন, তাঁর ভোট কাটার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে দীর্ঘদিন পর তাঁর প্রিয়জনেরা সম্প্রতি দৃশ্যতই বেশ ট্যা-ফুঁ করছে দেখলাম। কিন্তু করলে কী হবে? 'বিজেপি এসে গেল' বলে ক্ষুধার্ত কাকের (দুধেল গাই) সামনে একটু ছোলা ছড়িয়ে দিলেই যে কেল্লা ফতে। ওদের জন্য বিকল্প রাজনৈতিক দল কোথায়? তাই কুছ পরোয়া নেহি। দিনের শেষে ভোট যে পড়বে মুখ্যমন্ত্রীর বাক্সেই। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এই ভোটের স্বার্থে ঠিক কখনো কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করে চুপ থাকতে হয়। তাই তাঁর প্রিয় মুসলমান নেতা-মন্ত্রী মায় মজহবি মাতব্বরেরা প্রশ্রয়ে ডগমগ হবে যখন কেউ বলেন--- রাজ্যের সংখ্যাগুরু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কেটে ভাগীরথীতে ফেলে দেব বা দুর্ভাগাদের (অমুসলমানদের) কোরান পড়িয়ে ইসলামে আনবো ইত্যাদি। তখন তিনি কিন্তু একেবারে চুপ।

মুখ্যমন্ত্রী এখন তার প্রিয় দুধেল গাইদের দিল্লি যেতে বলছেন। কিন্তু বিগত ছয় মাস ধরে ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে তার নেতা-মন্ত্রী, সঙ্গী-সাথীদের নেতৃত্বে কলকাতাকে অচল করে একাধিক মহাসমাবেশ তাহলে কীভাবে হয়ে গেল? খোদ কলকাতায় গাড়ি থেকে গেরুয়া পতাকা নামিয়ে তারা রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারল কার প্রশ্রয়ে? শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদের সঙ্গে পেশী আস্ফালনের চিত্র আমাদের চোখে কীভাবে ধরা পড়ল? মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো নেতাজী ইনডোরে হাজার হাজার ভাতা প্রাপক ইমামদের নিয়ে ওয়াকফ বাঁচানোর সমাবেশ করলেন। প্রশ্ন : এই সভা তিনি তো দিল্লিতে গিয়েই করতে পারতেন? শুধু তাই নয়, 'ইসলাম খত্‌রে মে' স্লোগান দিয়ে গত ২০ ডিসেম্বর রানি রাসমণি রোডে ত্বহা সিদ্দিকীদের বিশাল সমাবেশে বক্তা ইমামরা জেহাদের বাণী শুনিয়ে অসচেতন ধর্মপ্রবণ শ্রোতাদের থেকে জানতে চাইলেন— কারা কারা আল্লার সম্পত্তি ওয়াকফ রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে চান, তারা হাত তুলুন। যা উদ্বেগের সঙ্গে আমরা সকলেই শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রী কি শোনেননি?

লাগাতার এহেন প্রশ্রয়ের কুফলস্বরূপ যা হবার অবশেষে সেটাই হলো। ঠিক তার কিছুদিন পরেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুর ইত্যাদি জায়গা জুড়ে ওয়াকফ আন্দোলনের নামে নজিরবিহীনভাবে নিরীহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর জঙ্গি সুলভ হিংসা দেখলাম। এটি কি শুধুই কাকতালীয়? এর দায় কার? যারা ওয়াকফের জন্য প্রাণ দিতে পারে— তারা কারও প্রাণ নিতেও যে পারে। এবার সেই প্রাণ নেওয়া হিংসার দৃশ্যে একটু আসি।

ওরা মিছিল করে সশস্ত্র হয়ে কেন ধেয়ে আসছে? ওদের ওয়াকফ সম্পত্তি নাকি কেন্দ্রের মোদী সরকার আইন করে লুটে নিচ্ছে। কিন্তু তাতে আমাদের কী অপরাধ? তখনও ওরা বুঝতে পারেননি যে, ওদের অপরাধ— ওরা অন্য ধর্মের। তবে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে বিধর্মী পর্যটকদের গণহত্যা করতে যেমন কলমা পড়তে পারে কিনা যাচাই করা হয়েছিল, এখানে তেমনটির প্রয়োজন হয়নি। কারণ স্থানীয়রা যে সবাইকে চেনেন। তাইতো বেছে বেছে শুধু কয়েকশো বিধর্মীদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট আক্রমণ করা হলো। এমনও অভিযোগ যে বাড়ির মহিলাদের না কী শর্ত দেওয়া হয়েছিল— যদি মুক্তি চাও, নিজের শরীর আমাদের হাতে সঁপে দাও।

কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধেয়ে এল ইট, পাথর, লাঠি, ছুরি, রড। ভাঙা শুরু হলো ঘরের দরজা। দোকানপাটে শুরু হলো ভাঙচুর, লুটপাট। অগ্নিসংযোগ। বাঁচলো না অ্যাম্বুলেন্স, এমনকী মন্দিরও। উল্লেখ্য যে, মাথায় টুপি দিয়ে ধর্মীয় স্লোগান আউড়িয়ে যারা বেছে বেছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর বর্বরোচিত হামলা সংঘঠিত করল, তাদের বেশিরভাগের বয়স যে মাত্র পনের, কুড়ি। যাদের কিছুজন চেনা, স্থানীয়! কিন্তু বাকিরা? সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহলে ওরা কি ছিল ভাড়া করা দাঙ্গাবাজ? এত কিছু ভাবতে না ভাবতেই ওই হিংস্র জানোয়ারের দল ঘরের মধ্যে ঢুকে সব কিছু ভেঙেচুরে লুটপাট করতে শুরু করে দিল। ঘরের মহিলারা নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে ছাদের ছোট্ট কুঠুরিতে লুকিয়ে তখন ঠকঠক করে কেঁপেই চলেছে। স্থানীয় থানা ফোন তুললেই শুনছে শুধু আর্তনাদ— বাঁচান, বাঁচান। ওরা যে মেরে ফেলবে।

কিন্তু অসহায় পুলিশ যেন নিশ্চল, ঠুঁটো জগন্নাথ। কোনো নির্দেশে কি? না কি শুধুই আতঙ্কে? নিরীহ প্রতিমা শিল্পী হরগোবিন্দ, চন্দনদের তখন থেঁতলে মারার জেহাদ চলছে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব লীলা চলার পর পুলিশের ভয়ার্ত উত্তর পেল ওই অসহায়রা— 'আমরা কি করে আপনাদের বাঁচাতে যাব, আমরা নিজেরাও যে এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।' অবশেষে নেতিয়ে পড়ল চন্দনদের প্রাণহীন দেহ। অবশেষে আতঙ্কিত, অত্যাচারিত কয়েকশো পরিবার ঘরছাড়া হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো অন্য জেলায় বা রাজ্যে। এই ক'দিন আগে ঘটা মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, জঙ্গিপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এহেন মজহবি জঙ্গিপনা যে আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এত ভয়ংকর না হলেও রাজ্যের অন্যত্রও চলেছে বিক্ষোভের নামে উন্মত্ততা। অথচ প্রতিকার নয়--- দেখলাম, রাজ্য জুড়ে হলো শুধু রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, পারস্পরিক দোষারোপের পালা আর সঙ্গে অবশ্যই সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বর্ষণ। এবার এত ঘৃণা বর্ষণের উৎস সন্ধানে যাওয়া যাক—

এই সব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বিক্ষোভ, মিছিল, হিংসা, খুনের নেপথ্যে রয়েছে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের উপর তৈরি একটি সংশোধনী বিল। যা গত এপ্রিল, ২০২৫-এ লোকসভা ও রাজ্যসভায় সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সংশোধিত হয়ে ওয়াকফ (সংশধনী) আইন, ২০২৫-এ পরিণত হয়েছে। যার পুরো নাম ইউনিফায়েড ওয়াকফ, ম্যানেজম্যান্ট, এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট। এককথায় 'উম্মীদ'। বাংলায় যার অর্থ 'আশা'। নতুন ভোর। নতুন স্বপ্ন।

ইসলামিক আইনে এই 'ওয়াকফ' আসলে কোনো মুসলিম কর্তৃক তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিকে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আল্লার নামে দান। যা হস্তান্তর, বিক্রি না পরিবর্তন করা যায় না। আল্লা যেমন চিরস্থায়ী, ওয়াকফ

ঠিক তেমনই চিরস্থায়ী। এক্ষেত্রে ওয়াকফ দানকারী ‘ওয়াকিফ’ তার ওনারশিপ স্থায়ীভাবে আল্লার কাছে সমর্পণ করে। যে সম্পত্তি থেকে লাভবান হবে গরিব অনগ্রসর মুসলমানরা।

তাহলে প্রশ্ন, এই ওয়াকফের সংশোধনী এনে সরকার পক্ষ এত সমালোচনার মুখে পড়ল কেন? কেনই-বা এত হিংসা, উত্তেজনা, গেল গেল রব? তাই প্রথমেই দেখা দরকার— এই আইনের প্রাসঙ্গিকতা তথা উপযোগিতা মূল্যায়নে সরকার কি জানিয়েছে :

১. এই আইন ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনবে।

২. ওয়াকফ সম্পত্তিতে যথাযথ হিসাবরক্ষক ও নিরীক্ষণের অভাব দূর হবে।

৩. ওয়াকফ ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক অদক্ষতা নির্মূল হবে।

৪. কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করবে।

৫. বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে একটি কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে দেশের সমগ্র ওয়াকফ সম্পত্তিকে ট্র্যাক করা হবে।

৬. সম্পত্তির যথার্থ সনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

৭. ওয়াকফ সম্পত্তির দখলদারিত্বের প্রশ্নে দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা অমীমাংসিত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হবে।

৮. সেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি প্রকৃত ওয়াকফের আর কোনটি নয়— তার মূল্যায়নে এতদিন ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল ও সার্ভে কমিশনার যে ক্ষমতা ভোগ করছিলেন— এখন থেকে জেলা কালেক্টর সেই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

৯. ওয়াকফ সম্পত্তির নিশ্চিতকরণে ওয়াকফ বোর্ড এতদিন যে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিল— তাতে লাগাম পরানো হবে।

বিশেষ করে ওয়াকফ আইনের ৪০ নম্বর ধারার সুযোগ নিয়ে বোর্ড যেভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্বেগ বাড়িয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা সরকারি সম্পত্তিকে ইতিমধ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে— তা রোধ করা হবে। অভিযোগ, দেশে মোট ৫৯৭৩টি সরকারি সম্পত্তিকে ওয়াকফ বোর্ড ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে ওয়াকফ করেছে। তামিলনাড়ুর তিরুচেন্দুরাই, বিহারের গোবিন্দপুরে, কেরালার এর্নাকুলামে বা কর্ণাটকের বিজয়পুরায় এভাবেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ওয়াকফ করার অভিযোগ উঠেছে ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে।

১০. অপরদিকে দেশজুড়ে প্রকৃত ওয়াকফ সম্পত্তি, যা মূলত মুসলমান সমাজের ক্ষমতাশালী কায়েমি স্বার্থবাদীরা কুক্ষিগত করে রেখেছে— তা উদ্ধার করে সেই সম্পত্তি প্রকৃত বেনিফিশিয়ারি পশ্চাদপদ বা পাসমন্দা মুসলমানদের হিতে ব্যবহার করা হবে। কীভাবে? তার ব্যাখ্যা এই আইনে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে কেবল পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ পসমন্দা মুসলমানদের শিক্ষা, সামাজিক মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য তথা ধর্মীয় প্রয়োজনে এই ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় বা রাজস্ব ব্যয়িত হবে। বিশেষ করে, মুসলমান নারী ও শিশুদের এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেমন, তালাক ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রদান, মহিলাদের জন্য স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠন, তাতে অর্থদান, মহিলাদের বৃত্তি দান, তাদের ক্ষুদ্র শিল্প ও স্বরোজগারে ঋণ দান, তাদের আইনি সহায়তা দান, অসহায় মহিলাদের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সহায়তা দান ইত্যাদি কল্যাণকর কাজে ওয়াকফেরে অর্থ ব্যয়িত করার ‘আশা’ এই ‘নতুন উম্মীদ আইন’-এ উল্লিখিত রয়েছে।

১১. দেশের ৩২টি ওয়াকফ বোর্ডের হাতে থাকা প্রায় ৯ লক্ষ একর পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী আয় বা রাজস্ব বৃদ্ধি করে, সেই আয়কে প্রকৃত প্রাপকদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় আনা।

(লেখক ভারত সরকার দ্বারা ‘পদ্মশ্রী’ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা ‘শিক্ষারত্ন’ সম্মানে ভূষিত)

পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়ার সাতকাহন

নিলয় সামন্ত

নর্মান প্রিচার্ড জন্মেছিলেন কলকাতায়। ১৮৭৫ সালে জন্ম। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতাতেই ছিলেন। তাই তাকে বাঙ্গালি বলা চলে কি? যদি তাই হয় তাহলে ১৯০০ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি প্যারিস অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করেন। তার ইভেন্ট ছিল ২০০ মিটার হার্ডেলস।

এতখানি পিছনে চলে যাওয়ার কারণ হকিতে কেশব দত্ত, লেসলি ক্লডিয়াস, গুরুবক্স সিংহ আর যোগিন্দর সিংহ, সাঁতারে আরতি সাহা ও নীলিমা ঘোষ, শুটিংয়ে জয়দীপ কর্মকার, তিরন্দাজিতে অতনু দাস, দোলা ব্যানার্জি, রাহুল ব্যানার্জি আর যদি অতনুর স্ত্রী দীপিকা কুমারীকে ধরা যায়, তাহলে তিনিও বাঙ্গালি।

শেষ অলিম্পিক হয়ে গিয়েছে প্যারিসেই। গত বছরে। আগে হকি ছাড়া ভারত সোনা পেত না। এখন সোনা পাচ্ছে। রুপো পাচ্ছে। কিন্তু তারা ভিন রাজ্যের। তবে এ নিয়ে হা-হুতাশ করার কিছু বোধহয় প্রয়োজন নেই। তার কারণ ফুটবল আর ক্রিকেটের বাইরে খেলাটাকে বাঙ্গালির অবহেলাই করেছে। তা সে সাধারণ মানুষই হোক অথবা নেতা-নেত্রী।

তবে বিভিন্ন খেলার কর্তা হতে এখন সবাই রাজি। সুযোগ পেলেই যে কেউ কর্তা হয়ে যাচ্ছেন। তার কারণ খেলায় এখন টাকা এসেছে। সেই টাকা লুটেপুটে নেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। অলিম্পিকে যদি এই ধরনের কোনো ইভেন্ট থাকতো তাহলে বোধহয় সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অনেক প্রতিনিধি পাওয়া যেত।

অলিম্পিকের মতো বিশ্বের আঞ্চলিক গেমস হলো আমাদের এশিয়ান গেমস। আরও আঞ্চলিক সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেমস। তারপরে হলো ভারতের মধ্যে ভারতীয়দের জন্য ন্যাশনাল গেমস। এবার উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে সার্ভিসেস, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রথম পাঁচে। পশ্চিমবঙ্গ সোনা জয়ের বিচারে ৮ নম্বর, মোট পদকের বিচারে ১৩ নম্বরে। অন্যবারের তুলনায় ভালোই ফল। সে বিচারে রাজ্য গেমস রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। যা এক লহমায় বলে দেয়, খেলায় কোন জেলার কী দশা।

মালদা শহরে গেলে আজও দেখা যাবে, সৌরভকে স্বাগত জানিয়ে পুরোনো পোস্টার-ব্যানারের ছড়াছড়ি। মালদায় প্রথম আবির্ভাব, এই ছিল ট্যাগলাইন। দিনকয়েক আগে আরও বেশি অন্য তোরণ ছিল শহরের অলিগতিতে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিশাল কাটআউট। কী না? রাজ্য গেমস হচ্ছে শহরে। গেমস হয় নেতাজীর নামে। মালদার একটা গেটেও নেতাজীর ছবি নেই।

মালদায় রাজ্য গেমস করেছে পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক সংস্থা ও মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ক্ষতের মতো ফুটে উঠেছে কর্তাদের ব্যর্থতা। নিয়ম হচ্ছে,

প্রতিদিনই পদকতালিকা প্রকাশ বাধ্যতামূলক। সেটাই সেখানে মেলেনি। বোঝা কঠিন, কোন জেলা ভালো করল, কোন জেলা ব্যর্থ। গেমস শেষ হয়েছে সেই ১০ এপ্রিলে। এতদিনেও স্থানীয় সংগঠকরা চূড়ান্ত পদকতালিকা পাঠাতে পারেননি রাজ্য অলিম্পিক সংস্থায়।

বিওএ কর্তারা আরও চালাক। তাঁরা মালদা গেমসের চেয়ারপার্সন করেছিলেন স্বরূপ বিশ্বাসকে। এমনিতে তিনি আইএফএ-র ভাইস প্রেসিডেন্ট। পদের গুরুত্ব কিছু নেই। বিওএ কর্তারা কীভাবে রাজ্য গেমস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোককে এত বড়ো দায়িত্ব দেন? এখানেও শোনা গেল, ভোটের খেলা। বিওএ-তে মুখ্যমন্ত্রীর দাদা-ভাইয়ের যুদ্ধে স্বরূপ ও বিশ্বরূপ দে বড়ো ভূমিকা নেন দাদাদের জেতাতে। তাই পুরস্কার।

রাজ্য গেমসের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো হলো, মালদায় যে প্রতিযোগীরা গিয়েছিলেন, তাঁদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। খাবার দেখে চোখে জল এসেছে। বাথরুমে যেতে হয়েছে গ্লাসে জল নিয়ে। থাকার অনেক জায়গায় খড় পেতে শোয়া। অনেক প্রতিযোগী রাতে মালদার রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছেন ভালো খাবারের খোঁজে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাথা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বা স্বরূপ বিশ্বাসদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মাথাব্যথা ছিল না, সফল ক্রীড়াবিদদের নামগুলো সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরতে। তাহলে কী লাভ রাজ্য গেমস করে?

স্বরূপ-কৃষ্ণেন্দুর যুগলবন্দির গেমসে জেলাগুলো যেমন পদকতালিকায় অবস্থান জানতে পারেনি, চ্যাম্পিয়নরা জয়ের সার্টিফিকেট পর্যন্ত পাননি। আজও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওগুলো পেতে। গেমসের হিসেবের তো কোনো বাম-মা নেই। মুখ্যমন্ত্রীর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বিওএ অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান) ও ক্রীড়ামন্ত্রীর ভাইয়ের এত বোঝাপড়ার অভাব ভাবলেও অবাক লাগে।

জানা গেল, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে গেমস চলাকালীন ৫ এপ্রিল কলকাতায় বিওএ অফিসে গিয়েছিল একটা হিসেব। সেখানে দাবি ছিল, খরচ ৪৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩০০ টাকা। এমন অগোছালো, অরাজকতার গেমসে এত খরচ কী পথে হয়, প্রশ্নে বিওএ অফিসে তোলপাড়। আগে কোনো গেমসে এত খরচ হয়নি। অথচ অধিকাংশ অ্যাথলিটের দিনে ভাত-সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি-ডাল-টকদই জুটেছে। ওই হিসেবে শোনা গেল, ভিআইপিদের থাকার খরচ ২১ লক্ষ ৩ হাজার ৭০০ টাকা, মাঠের প্রস্তুতিতে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৬০০ টাকা, প্যান্ডেল ৫ লক্ষ ২০ হাজার, বিদ্যুৎ ৪ লক্ষ ৭০ হাজার, পানীয় জল ২ লক্ষ ৫ হাজার, ফ্লেক্স-হোর্ডিং ৫ লক্ষ ৩০ হাজার।

একজন তারকাও কিন্তু যাননি। যাননি জাতীয় গেমসে পশ্চিমবঙ্গের সফলরাও। রাজনীতির মাথারা খেলায় জড়িয়ে থাকলে কিছু করার নেই। অনেক অনুনয়-বিনয় করায় টাকার অঙ্ক এক লাফে ৪৩.৩৬ লক্ষ থেকে ৩৬.৯৯ লক্ষে নেমেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যিই এক খরচ হলে এক ধাক্কায় এত কমে কী করে?

গত ২২ এপ্রিল মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব (এই পদে এমন রাজনীতিক কেন) হিসেবে কৃষ্ণেন্দু যে হিসেব দেন, তাতে ৪৬ লক্ষ থেকে ৯৯ লক্ষের মধ্যে কোথায় কী খরচ শুনবেন? বিছানা, বালিশ, বেডশিট ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৯০০ টাকা। প্যান্ডেল-চেয়ার-টেবিল ৭ লক্ষ ২৫ হাজার। মাইক ২ লক্ষ ৯০ হাজার। ডিজি ২ লক্ষ ৫০ হাজার। জেনারেটার ১ লক্ষ ৫০ হাজার। মেটাল হ্যালোজেন দেড় লক্ষ। মাহেশ্বরী ভবন ৬৬ হাজার। হোটেল ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৯০০। গেট ৩ লক্ষ। বড়ো ফ্লেক্স ৮০ হাজার। ছোটো ফ্লেক্স ৯১ হাজার ২০০।

হিসেবের নীচে আলাদা করে সংযোজন কিছু খরচ। বাস ও জ্বালানির ২ লক্ষ ১০ হাজার। বাস, গাড়ি মিলিয়ে আবার ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার। খাবারের ৩৭ লক্ষ। পরিবহণ ও খাবারের খরচ কৃষ্ণেন্দু বহন করবেন বলে নোটে বলা হয়েছে। তাদের দাবি, বিওএ দিয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ। দ্বিতীয় দাবি, গত ৯ এপ্রিল প্রথম বাজেট দেওয়া হয়েছিল ৩০ লক্ষের। এত বিলের বিস্তারিত তথ্য কিন্তু বিওএ পায়নি এই লেখা পর্যন্ত।

বিওএ-র এক কর্তা আক্ষেপ করলেন, 'আগে উত্তরবঙ্গে গেমস করে আমাদের লাভ হয়েছিল। এখন তো স্পনসর থাকলেও শুধু ক্ষতি।' একসময় কোচবিহারের রবি ঘোষ, মালদার তপন শিকদার খেলা ভালোবেসে কোনো টাকা না নিয়ে গেমস করেছিলেন দু'বার। নিজেদের উদ্যোগে। জিটিএ-র মতো সংস্থা নিজেরা দু' লক্ষ টাকা দিয়েছিল বিওএ-কে। এখন উলটপুরাণ'। বিওএ কর্তার বিস্ময় মমতা-অরূপের ছবি দেওয়া গেটগুলো তো স্পনসরড। তা হলে তার জন্যও টাকা দেখালো কী করে?

আরও আছে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার প্রতীক মালদা গেমসের জন্য অনেক বিশেষ টি শার্ট হয়েছিল। কলকাতা-মালদায় সেসব বিতরণ করল কারা, কোথায়ই-বা করল, কেউ জানে না। অনেক শার্ট চলে গিয়েছে নিউ আলিপুরের ক্লাবে। খেলার অনেক দামি অ্যাপারেটাস কলকাতা থেকে মালদা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল টাকা খরচ করে। সেসব জিনিসপত্র দীর্ঘদিন মালদায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ফেরানোর চেষ্টা নেই। □

মাওবাদের বিরুদ্ধে নাগরিক সচেতনতা ও প্রচার প্রয়োজন

বিপ্লব বিকাশ

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হলে আমাদের মন সাধারণত পাকিস্তান-প্রযোজিত সন্ত্রাসবাদের দিকে চলে যায়। পুলওয়ামা, উরি, পহেলগাঁওয়ের ঘটনা স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কিন্তু অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আরও বড়ো রক্তপিপাসু রয়েছে, তা হলো মাওবাদ। গত দুই দশকে মাওবাদী হিংসায় প্রায় ১২ হাজার সাধারণ মানুষ এবং ৩ হাজার নিরাপত্তাকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। এ শুধু সংখ্যা নয়, গণতন্ত্রের পিঠে ক্রমাগত আঘাত করে চলা অদৃশ্য ছুরি।

মাওবাদ কোনো সাধারণ হিংসাত্মক কার্যকলাপ নয়; এটি একটি বামপন্থী মতাদর্শের সম্প্রসারণ, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বন্দুকের নলের দ্বারা 'ন্যায়' প্রতিষ্ঠার নামে জঘন্য অপকর্ম। মাওবাদীরা ভারতের পিছিয়ে থাকা অঞ্চল যেমন— বস্তার, দান্তেওয়াড়া, গড়চিরৌলির মতো জায়গায় জনজাতি অসন্তোষ ও দারিদ্র্যকে অস্ত্র বানিয়ে তথাকথিত 'জনবিপ্লব'-এর কাঠামো গড়ে তুলেছে। বছরের পর বছর ধরে এরা সমান্তরাল সরকার, জনআদালত, সংগঠিত সেনা, অস্ত্র কারখানা ও মতাদর্শগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছে।

আজ ভারত সরকার যখন 'মাওবাদমুক্ত ভারত'-এর লক্ষ্যে অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্টের মতো অভিযানে নেমেছে, তখন বুঝতে হবে এই লড়াই কেবল সামরিক নয়, আদর্শগতভাবেও লড়তে হবে। এটি বিমর্শের যুদ্ধ, জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করার যুদ্ধ। এখানে সজ্জন সমাজের ভূমিকা অপরিহার্য। কারণ চিন্তাশীল সুধীজনদের হাতেই রয়েছে মাওবাদী প্রচারের মোকাবিলা করার শক্তি।

মাওবাদীরা শোষণহীন সমাজ, সামাজিক ন্যায় এবং জনকল্যাণকারী বিপ্লবের মোড়কে নিজেদের মতাদর্শকে সম্প্রসারিত করে। কিছু মিডিয়া, শিক্ষা সংস্থান এবং শহরের তথাকথিত প্রগতিশীলরা এদের আরও উৎসাহিত করে। এই দেশবিরোধী শক্তির মোকাবিলা কেবল নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে সম্ভব নয়; দরকার সত্যনির্ভর প্রচার এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা।

গ্রামেগঞ্জে, স্কুলে-কলেজে ও পঞ্চায়েতে পরিষ্কার করে বলতে হবে যে মাওবাদ শুধু ধ্বংস আনে, শিক্ষা নষ্ট করে, স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ ধ্বংস করে ফেলে। এই বার্তাগুলোকে তুলে ধরতে হবে, যেন মানুষ বুঝতে পারে প্রকৃত উন্নয়নের মানে কী। উদাহরণস্বরূপ, বস্তারের গ্রাম যেখানে একসময় মাও প্রভাবিত ছিল, আজ সেখানে বিদ্যুৎ এসেছে, মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সরকারের দ্বারা এই পরিবর্তনের প্রচার করতে হবে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মতো বড়োক্ষেত্রেও এদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ডিজিটাল প্রহরী' হয়ে এদের ভ্রান্ত প্রচারের মুখোশ খুলে দিতে হবে। প্রতিটি সঠিক পোস্ট, ভিডিয়ো বা সংবাদ— এই বিমর্শের লড়াইয়ে এক একটি অস্ত্র।

মাওবাদীরা তাদের প্রভাবিত অঞ্চলে স্থানীয় নেতৃত্বকে হত্যা বা ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে দিয়ে থাকে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাজ হবে স্থানীয় কণ্ঠকে মঞ্চ দেওয়া, কমিউনিটি রেডিয়ো, স্থানীয় পত্রিকা এবং ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের অপকর্মের বার্তাগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া। জনজাতি শিল্প ও সংস্কৃতিকে পুনর্জাগরণের মাধ্যমে মাওবাদী 'জনসংস্কৃতি'-র ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে দিতে হবে।

অপারেশন সিঁদুরের বিরুদ্ধে যেভাবে বামপন্থী দলগুলো রাস্তায় নেমে পাকিস্তানের পক্ষে ভারতবাসীকে প্রশ্ন করছে যে 'কীসের ভারত?', 'কী প্রমাণ আছে যে পাকিস্তান হামলা করেছিল?' সেই দল আবার বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র, উকিল, জনজাতি জনগোষ্ঠী রূপে 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'-এর বিরুদ্ধেও রাস্তায় নামবে। তারা শিক্ষা সংস্থান, সোশ্যাল মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চকে ব্যবহার করে মাওবাদীদের বাঁচানোর জন্য 'প্রেশার গ্রুপ' তৈরি করবে। জনগণকে বিভ্রান্ত করবে যে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের দেশের গরিব মানুষের উপর সৈন্যশক্তি দিয়ে নিপীড়ন করছে। কিন্তু একবারও বলবে না যে এই মাওবাদীরা সন্ত্রাসবাদীদের থেকে বেশি সাধারণ মানুষ ও সৈনিককে হত্যা করেছে, তারা তাদের দখল করা অঞ্চলের উন্নয়ন হতে দেয়নি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে সেসব অঞ্চলের মানুষকে জোরজবরদস্তি দূরে রেখেছে। কলকাতা-সহ বিভিন্ন শহরের পথে যখন এই বামপন্থী-জামাত জোট নামবে, তখন এই সত্যটা জনগণের সমক্ষে রাখতে হবে।

এই যুদ্ধ শুধু জঙ্গলে নয়, চিন্তাভাবনার মাধ্যমেও করা হচ্ছে। বন্দুকের গুলি যতই ভয়াবহ হোক, সঠিক বিমর্শের শক্তি তার চেয়েও বেশি। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মাওবাদকে পরাজিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় 'লোক-চেতনার সশক্তিকরণ', তবে প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকা কৌশলগত হয়ে উঠবে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যকে, ভয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাসকে এবং হিংসার বিরুদ্ধে উন্নয়নকে দাঁড় করাতে পারেন। যখন এই চেতনা জাগ্রত হবে, তখনই 'মাওবাদমুক্ত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। এই যুদ্ধ কোনো এক সরকারের নয়, কোনো এক বাহিনীর নয়, এটি সমগ্র সমজের যুদ্ধ। আর এর বিজয় পতাকা সেই হাতে উঠবে যে কলম, কীবোর্ড ও সংবাদকে অস্ত্র বানিয়ে বামপন্থী রক্তপিপাসু চেহারাকে জনসমক্ষে তুলে ধরে নাগরিক চেতনা নির্মাণ করতে পারবে। ভারতের সামরিক শক্তি এদের নির্মূল করতে সক্ষম, তবে এরা যে সমস্যাগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, তার নির্মূলনের জন্য সমাজ ও সরকারকে নীতিগত সিদ্ধান্তে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। □

মহাকাশে ইসরোর জোড়া স্যাটেলাইটের 'ডগফাইট'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাক সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর তরফে 'অপারেশন সিঁদুর' চলার সময় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'-ও সৃষ্টি করল একটি ইতিহাস। এর ফলে ভারত অন্তর্ভুক্ত হলো এলিট তালিকায়। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানালো যে, গত ৮ মে মহাকাশে সংঘটিত হয়েছে ইসরো-র জোড়া স্যাটেলাইটের একটি 'ডগফাইট'। চন্দ্রযান-৩ থেকে আদিত্য এল-১ পরবর্তী পর্যায়ে মহাকাশেও আধিপত্য জারি রইল ভারতের।

বিশ্বের তাবড় দেশগুলি মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাতে বর্তমানে ইসরো-র দ্বারস্থ হয়। একটি সিনেমা তৈরির চেয়েও অনেক কম খরচে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাতে ইসরো এখন সিদ্ধহস্ত। পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে, মহাকাশে এক ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপন করল ইসরো। 'ডগফাইট' চালাল ইসরো-র দুটি স্যাটেলাইট। তাদের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৯,০০০ কিলোমিটার।

দুটি স্যাটেলাইটের মধ্যে উচ্চগতিতে নানারকম কসরত বা খেলা দেখানোকে পোশাকি ভাষায় বলে ডগফাইট। শুনতে সহজ হলেও আসলে অত্যন্ত জটিল বিষয়। নিয়ন্ত্রিত উপায়ে কখনও একে অপরের দিকে তীব্র গতিতে তারা ছুটে যায়, আবার খুব কাছে গিয়েও একে অপরকে ধাক্কা না দিয়েই ফিরে আসে। উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন স্যাটেলাইটকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নিজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেখাল ভারত। স্পেড-এক্স মিশনে ব্যবহৃত ইসরো-র দুটি স্যাটেলাইট এসডিএক্স-০১ ও এসডিএক্স-০২ মহাকাশে সংঘটিত করল এই সিমুলেটেড ডগফাইট। মিসনের অবশিষ্ট জ্বালানি খরচ করে এই ডগফাইট চালিয়ে দেখে নেওয়া হলো ডকিং, রি-ফুয়েলিং, এমনকী ভবিষ্যতে আত্মরক্ষাতে কতটা দক্ষ এই স্যাটেলাইটগুলি। এই পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, বিশ্বের হাতেগোণা কয়েকটি দেশই এভাবে পৃথিবী থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে উপগ্রহকে এত নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। সেই এলিট তালিকায় এবার নাম লেখাল ইসরো। তাও আবাম এমন সময়ে, যখন পাক জঙ্গি ঘাঁটিগুলির শিকড় উপড়ে ফেলতে অপারেশন সিঁদুর চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা।

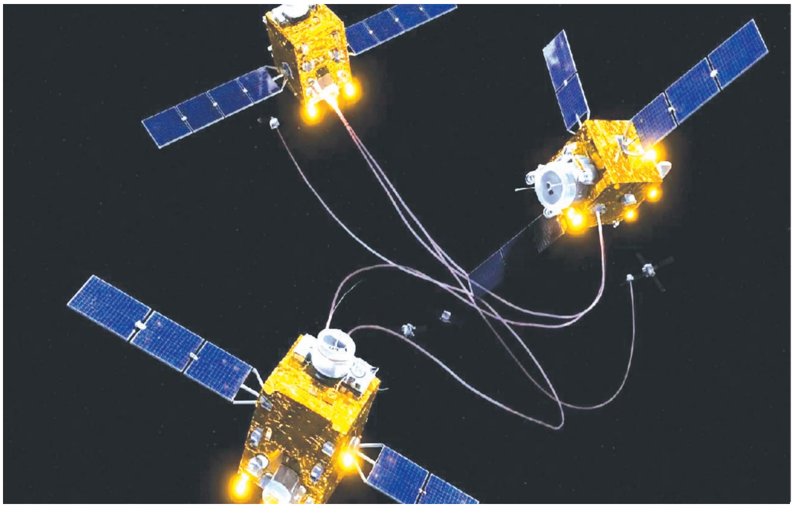

স্বাধীনতা ঘোষণা করল বালোচিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-পাকিস্তান সংঘাত চলাকালীন বালোচিস্তান জুড়ে পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে সংঘটিত হচ্ছিল বালোচ সংগ্রামীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের একের পর এক পর্ব। এরই মাঝে গত ৯ মে লেখক ও সমাজকর্মী মির ইয়ার বালোচ সোশ্যাল মিডিয়ায় বালোচিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নয়াদিল্লির প্রতি সাহায্যের আবেদন জানান। সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টে বালোচিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণার পাশাপাশি নয়াদিল্লিতে একটি বালোচ দূতাবাস খোলার জন্য ভারত সরকারের অনুমতি চেয়েছেন তিনি।

বালোচ জনগণের অধিকারের পক্ষে সরব থাকার জন্য পরিচিত মরি ইয়ার বালোচ। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ ধারাবাহিক পোস্টের মাধ্যমে তিনি বালোচিস্তানের বাসিন্দাদের উপর পাকিস্তানি সেনা অত্যাচারের কথা তুলে ধরছেন। এই আবহে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে ভারত প্রত্যাঘাত হানতেই বালোচিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানালেন মির ইয়ার বালোচ। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বালোচিস্তানে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর আহ্বান জানানো-সহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ওই এলাকা ত্যাগ করার দাবি জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি বালোচ মুক্তিযোদ্ধারা ডেরা বুগতিতে একটি গ্যাসক্ষেত্রে হানা দেয়, যেখানে ১০০টিরও বেশি গ্যাস কূপ রয়েছে।

শোক সংবাদ

পুরুলিয়া জেলার আদ্রা নগরের স্বয়ংসেবক তথা ডিপিআরএমএস-এর সদস্য দেবাশিস মিশ্রের মাতৃদেবী গত ৫ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বৎসর। তিনি দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের রেখে গিয়েছেন।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(১৮)

অগ্নিশিখা

বিপ্লবী জীবন হলো অগ্নিশিখা উৎসের মতো, অপরকে আলোকিত করতে নিজেকে সর্বদা দাহিত হতে হয়। কাউকে কোনো কষ্ট-দুঃখ-শোক-ক্লেশের কথা বলার অবকাশ থাকে না। লক্ষ্য শুধু একটাই, কর্তব্যের ডাক আসামাত্র অবিলম্বে নিজেকে সেই কার্যে সমর্পিত করা।

একটি ঘটনার কথা, একদিন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে মহারাষ্ট্র নিবাসে এলেন। কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় তরুণকে একটু পাশে আলাদা ডেকে নিলেন তিনি। সবাই তখন খুব উদ্‌গ্রীব জানার জন্য, কী এমন হয়েছে যে এরকম স্থিতধী বিপ্লবী মানুষটি এমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। খুব সন্তর্পণে বিষয়টা শ্যামসুন্দরবাবু সকলের কাছে তুলে ধরলেন।

তিনি জানালেন মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি থেকে আসা এক বিপ্লবী তরুণকে কলকাতার অনতিদূরে এক গ্রামে রাখা হয়েছে। তরুণটি বিদেশ থেকে বোমা তৈরি শিখে এসে এখানে অজ্ঞাতবাস নিয়েছিল। তার কাজ ছিল ওখানকার তরুণ বিপ্লবীদের বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করে বোমা তৈরি শেখার কাজে তরুণরা সেখানে যাতায়াত করত। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত কাজ হতো গোপনে রাতের অন্ধকারে। একদিন তরুণটি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সমস্ত বিপ্লবী ছেলেরা তার যথেষ্ট চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার কোনো ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দেশমাতৃকার কাজে ঘর ছাড়া সেই বিপ্লবী তরুণ দেশমাতৃকার কাজ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। সে তার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে, তার অন্তিম সংস্কার যেন কোনো ব্রাহ্মণকে দিয়ে করা হয়। তাই সবাইকে এখুনি সেই গ্রামে যেতে হবে; সুষ্ঠুভাবে করতে হবে তার দাহ সংস্কারের ব্যবস্থা।

বলাবাহুল্য, এখানে সবার সঙ্গে কেশব হেডগেওয়ার এই করণীয় কর্তব্যের নির্দেশ শুনছিল। অনতিবিলম্বে কেশবরাও সদাশিব পিম্পুটকর-সহ ১০-১২ জন ছাত্র সেই গ্রামে পৌঁছে গেল। রাতের অন্ধকারে সেই বীর বিপ্লবীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে তার মৃতদেহ নিঃশব্দে নিয়ে যাওয়া হলো গ্রামের বাইরে দূরের জঙ্গলে। শোকাকুল তরুণ মনগুলিও দূরে দূরে ছুটে যাচ্ছিল যেন আগামী যুদ্ধপথের সন্ধানে, এক দৃঢ় সংকল্পের কর্মের আহ্বানে।

চিতায় শায়িত হলো মরদেহ; অগ্নিসংযোগের প্রাক মুহূর্তে কোথা থেকে ছুটে এলেন শ্যামসুন্দরবাবু। হাতে একটি পুঁথি। একজনকে প্রদীপ জ্বালাবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'মাতৃভূমির সেবায় আত্মোৎসর্গকারী এই দেশভক্তকে মন্ত্রবিহীন অগ্নিতে সমর্পণ করা যাবে না উচিত নয়।' চিতাশয্যা ঘিরে অশ্রুসজল নয়নে কয়েকজন তরুণ শুনছিল সেই সত্যের বাণী। একটি সুতোয় বাঁধা চশমা চোখের সামনে রেখে শ্যামসুন্দরবাবু পাঠ করে চললেন অন্তিম সংস্কারের মন্ত্রগুচ্ছ। একসময় চিতাগ্নি ঊর্ধ্বমুখে শিখা ছড়িয়ে জ্বলে উঠলো। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ আলোকিত করে তুললো। যেন এই মাতৃসেবককে স্বর্গপথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। কোন সুদূরের মায়ের কোল ছাড়া যুবক দেশমাতৃকার কোলে ঠাঁই নিল।

অজ্ঞাতবাসে এসে অজ্ঞাত রয়ে গেল সে। আকাশে তখন কালো মেঘের ঘনঘটা। চিতাগ্নি শান্ত করতে শান্তিবারি বর্ষণের উদ্দেশ্যে এ ছিল বুঝি বিধাতার আয়োজন। নয়নজলে বন্দনায় এই আত্মোৎসর্গী তরুণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে ফিরে এল সকলে শেষ প্রণাম জানিয়ে।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস